বাংলা
বিজ্ঞান কথা
Vol. I | Issue 3
নভেম্বর ২০২৩

টিকার নেপথ্যের মৌলিক গবেষণা পেল নোবেল স্বীকৃতি

জন্মগতভাবে আমাদের দেহের কিছু উপাদান (কোষ ও জৈব-অণু) প্রতিরক্ষার কাজে যুক্ত রয়েছে। যেমন—নিউট্রোফিল, ম্যাক্রোফাজ, ন্যাচারাল কিলার সেল এর মত কিছুকোষ এবং লাইসোজাইম, সি-রিয়াক্টিভ প্রোটিন, ডিফেন্সিন-এর মতো কিছু জৈব-অণু। এরা গড়ে তুলেছে দেহজ প্রতিরক্ষার একটি স্তম্ভ—ইননেট ইমিউনিটি বা সহজাত সুরক্ষা ব্যবস্থা।

- ম্যাক্সওয়েল ও তড়িৎচুম্বকত্ব
- যারা আলো জ্বেলেছিল
- পিথাগোরীয় ত্রয়ীদের মধ্যে কিছু বিন্যাসের সন্ধান

Shanti Foundation
RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

টিকার নেপথ্যের মৌলিক গবেষণা পেল নোবেল স্বীকৃতি ৬
সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

করতলে মহাকাশ ৯
পার্থ পাল

মহাকালের আশ্রয়ে উদয়কাল ১১
অমর কুমার নায়ক

ম্যাক্সওয়েল ও তড়িৎচুম্বকত্ব ১২
শামীম হক মণ্ডল

মোহনচূড়া ১৫
তাপস কুমার দত্ত

যারা আলো জ্বেলেছিল ১৬
অরুণাভ দত্ত

পিথাগোরীয় ত্রয়ীদের মধ্যে কিছু বিন্যাসের সন্ধান ২০
ভূপতি চক্রবর্তী

পরিবেশের সেকাল ২৪
মোহিত রায়

মিউ সেফেই ২৬
তুহিন সাজ্জাদ সেখ

নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ২৮

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের নভেম্বর মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৩০

গ্রন্থ সমালোচনা ৩২

সম্পাদক সমীপেষু

সুধী সম্পাদক,

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বিজ্ঞান কথা, তথা শারদ সংখ্যা পড়লাম। খুবই মনোগ্রাহী ও সময়োপযোগী তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকাটি বাংলায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্যসাধনে সফল। এই পত্রিকাটিকে সবার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করার জন্য যাঁদের অবদান আছে তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পাঠক হিসেবে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। নোবেল পুরষ্কার প্রাপকদের নাম ও অন্যান্য তথ্য খবরের কাগজ, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদিতে সহজলভ্য। যা সহজে পাওয়া যায় না তা হল, বাংলায় সহজবোধ্য ভাবে নোবেল প্রাপকের গবেষণার বিষয়বস্তু। যেমন, রসায়নের প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম ডট বা পদার্থবিদ্যার অ্যাটোসেকেন্ড ব্যাপারটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ জোগানোর মতো একটু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলা আছে এমন কোনও লেখা ইন্টারনেটে বা কোনো পত্রিকায় এখনো নজরে পড়েনি।

শুধু নোবেলজয়ীদের গবেষণা নয়, বিজ্ঞান কথার লেখকরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের গবেষণার বিষয়গুলিও সহজ ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের সামনে আসা দরকার। নাহলে বাংলা মাধ্যম স্কুলের বিজ্ঞান বই আর বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে দূরত্ব রয়েই যাবে; দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া।

বিজ্ঞান কথা আশা করি এধরণের উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হবে।

ধন্যবাদ সহ

শুভময় মিশ্র
হাওড়া - ১০৯

সম্পাদকমন্ডলীর উত্তর

প্রিয় শুভময় বাবু,

আপনার চিঠির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান মতামত পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ পথ চলায় বিশেষ সহায়ক হবে।

আমরা নোবেল পুরস্কার জয়ী গবেষণাগুলি সহজ সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। এই সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে 2023 সালে নোবেলজয়ী গবেষণা। আগামী দিনে একইভাবে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে নোবেলজয়ী গবেষণার বিষয়ে প্রবন্ধ অবশ্যই প্রকাশিত হবে। অন্যান্য বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়বস্তুও সহজ বাংলায় প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিজ্ঞান কথা সম্পাদকমণ্ডলী

বাংলা
বিজ্ঞান কথা
November 2023 | Vol. I | Issue 3

সম্পাদকীয়

শুভ বিজয়া এবং শুভ দীপাবলি

সংস্কৃতি, ভাষা এবং সম্প্রদায়ের বৈচিত্রে পরিপূর্ণ এই বৃহৎ পৃথিবীতে জ্ঞানের প্রচার ও জ্ঞান বিস্তার করার কাজটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যে কোন ব্যক্তির জন্য এটাই বিজ্ঞানের আশ্চর্য জগতের প্রবেশপথ। সার্বিকভাবে দেখলে বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর গবেষণার কাজকর্মের বিষয়ে মত ও চিন্তার বিনিময়ে ব্যবহৃত ভাষা প্রধানত ইংরেজি। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান সচেতনতা প্রচারের প্রয়োজন সর্বাধিক, বিশেষভাবে বাংলা ভাষায়। এই প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ভাষাজনিত বিভাজনের মধ্যে সেতুবন্ধন এবং বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীকে সশক্তকরণের মধ্যে দিয়ে তাদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান এমন এক সার্বজনীন ভাষা যা সমকালীন জটিল সমস্যাগুলি মোকাবিলার একমাত্র সহায়ক। এখনকার জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা থেকে শুরু করে চিকিৎসা পরিষেবা পরিচালনার জন্য বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর তার মধ্যে দিয়েই তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও টেঁকসই উন্নয়নের পথে এগোনো সম্ভব। তবে, মূলত ভাষাজনিত বাধার কারণে বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানের প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারে আরও সচেষ্ট হতে হবে, এবং বাংলা ভাষাতেও তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, তার সম্প্রচারনা ও প্রসারের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই যথেষ্ট সচেতন ও ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও ক্ষেত্রটিতে যে আশানুরূপ কাজ হয়নি সে ব্যাপারে সকলেই সম্ভবত একমত হবেন। অবশ্যই তার জন্য অনেক কারণ রয়েছে। প্রত্যেক যোগ্য বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-শিক্ষক, এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসকের কাছে আমার অনুরোধ, তারা তাদের মূল্যবান সময়ের কিছুটা বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বিস্তার করতে ব্যয় করুন। তারা এটি করতে পারেন ছোট জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিবন্ধ লেখার মধ্যে দিয়ে, যেখানে তারা শিক্ষার্থী, মহিলা, শিল্পী, কৃষক, যুবক এবং বয়স্ক সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাদের নিজেদের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন।

ভাষা শুধুমাত্র একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সংস্কৃতি, পরম্পরা, এবং জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহক। বাংলা বা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান পরিবেশনার মাধ্যমে সেই ভাষাভাষী মানুষকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বোঝার বা নতুন আবিষ্কারের কথা শোনার জন্য আগ্রহী করে তোলা যায় যা তাদের উন্নত জীবনশৈলীর সহায়ক হবে। সবসময়ই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণাগুলি মানুষের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়, প্রত্যেকেই সেই বিষয়গুলির সাথে তার পারপার্শ্বিকতার সম্পর্ক খুঁজে পান। এর ফলে রোজকার জীবনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকগুলির যোগ স্থাপনের সূচনা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞানমনস্কতার মেলবন্ধন ঘটায়। ইংরেজিতে যারা স্বচ্ছন্দ নন তারা ইংরাজিতে পরিবেশিত বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদি বা সংবাদের থেকে দূরেই থেকে যান। বিজ্ঞানের আঙিনায় যা ঘটে যাচ্ছে সেগুলি আঞ্চলিক ভাষায় তাদের কাছে তুলে ধরতে পারলে সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ বা সামাজিকভাবে মানুষকে কাছে টেনে আনার ব্যাপারে আমাদের যে খামতি রয়েছে তার অনেকটাই দূর করা সম্ভব।

শারদীয়া পূজো থেকে দীপাবলি, এই সময়টা আমাদের কাছে উৎসবমুখর। তবে, শীতের আগমনে আবহাওয়ার পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আমাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। দূষণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে এসময় বাতাসের গুণগত মান হ্রাস পায় যা শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগের কারণ হতে পারে। এই চিন্তা থেকেই আমাদের প্রাচীন যোগশাস্ত্র যোগব্যায়াম ও প্রাণায়ামের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। প্রাণায়ামের গুরুত্ব আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগের মোকাবিলায় এই সহজ অথচ কার্যকরী পন্থার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণায়ামের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল রয়েছে যা শুধুমাত্র ফুসফুসের ক্ষমতাকেই উন্নত করে না, অক্সিজেন গ্রহণকেও বর্ধিত করে। এটি ফুসফুসের বায়ুনালিকাগুলি পরিষ্কার করতে সহায়তা করে যা সামগ্রিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয়। দূষিত শ্বাসবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব প্রশমিত করার জন্য এই অনুশীলন সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হবে। যোগব্যায়াম শুধুমাত্র শারীরিক সুস্থতাই আসে না, এটি জীবনশৈলীর একটি অঙ্গ। যোগব্যায়ামকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত করে, আমরা শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অনেক বেশি সুস্থ থাকতে পারি। যোগব্যায়াম ও প্রাণায়ামের দৈনিক অনুশীলন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, মানসিক চাপ কমায় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সাথে সবার জন্যই মেধার বিকাশ, মানসিক স্থিতিশীলতা এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

সবাই সুস্থ থাকুন, বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উৎসব উপভোগ করুন, নিজেকে জলবায়ু-পরিবর্তন সম্পর্কিত অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখুন। আমরা জানি, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ সর্বদা ভাল এবং এটিই বিজ্ঞানমনস্কতার সঠিক রূপ।

ডঃ নকুল পারাশর

উপদেষ্টামণ্ডলী
স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী
ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
এবং
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

মরুভূমির উদ্ভিদের লবণের সাহায্যে জল শোষণ

ঘাম কিছু প্রাণীকে প্রচণ্ড গরমে ঠান্ডা রাখে। একইরকম লবণাক্ত ক্ষরণ মরুভূমির গুল্মকে আদ্র রাখতে সাহায্য করে। এক সাম্প্রতিক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। অ্যাথেল তামারিস্ক এক ধরণের মরু গুল্ম যা বাতাস থেকে জল শোষণ করার জন্য তার পাতা থেকে একটি বিশেষ ধরণের লবন নির্গত করে। গত 30 অক্টোবর 2023 *প্রসিডিংস অব ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেসে* এই বিষয়টি নথিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য গাছেরা যে সব রাসায়নিক কৌশল অবলম্বন করে সে বিষয়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে উপকূলীয় সমতলের শুষ্ক, লবণ-সমৃদ্ধ মাটিতে অ্যাথেল তামারিস্ক (*Tamarix aphylla*) জন্মাতে দেখা যায়। এই ধরনের উদ্ভিদ তার পাতার গ্রন্থি থেকে ঘনীভূত ফোঁটার আকারে অতিরিক্ত লবণ নিঃসরণ করে। দিনের উত্তাপে এই নিঃসৃত ফোঁটা আর্দ্রতা হারিয়ে সাদা স্ফটিকে রূপান্তরিত হয় যা পরে বায়বীয় আদ্রতা শোষণ করে গাছটিকে জল পেতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা এই স্ফটিকের উপর জলের ঘনীভবন লক্ষ্য করে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। এর জন্য বিশদ পর্যবেক্ষণ জরুরি ছিল। বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে গুল্মটির প্রাকৃতিক পরিবেশে টাইম-ল্যাপ্স ভিডিও ফটোগ্রাফির সাহায্য নেন। এই রেকর্ডিংএ দেখা যায় যে লবণের স্ফটিক যা দিনের বেলা নির্গমন থেকে তৈরি হয় তা রাতে জলের সংস্পর্শে এসে ফুলে যায়। গবেষকরা দেখতে পান যে 35° সেলসিয়াস এবং 80 শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় একটি প্রাকৃতিকভাবে ঘেরা শাখা দুই ঘন্টা পর তার পাতায় 15 মিলিগ্রাম জল সংগ্রহ করে, যখন একটি ধোয়া শাখা থেকে মাত্র এক-দশমাংশ জল পাওয়া যায়। কুয়াশা থেকে তরল জল আকর্ষণ করার জন্য অভিযোজিত পাতার কাঠামো সহ প্রচুর গাছপালা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু মরু অঞ্চলে প্রাকৃতিক জল শোষণের এই রাসায়নিক অভিযোজন নিঃসন্দেহে অভিনব। ●

নেপালের পর্বতমালা মাত্র 30 বছরে এক-তৃতীয়াংশ বরফ হারিয়েছে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে কঠোর সতর্কবার্তায়, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস প্রকাশ করেছেন যে নেপালের তুষারাবৃত পর্বতগুলি গত তিন দশকে তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বরফ হারিয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের নিকটবর্তী এলাকা পরিদর্শনের সময় এই উদ্বেগজনক উদঘাটন আসে। এর কারণ হিসাবে দেখা হচ্ছে নেপালের দুই দিকে অবস্থিত চীন ও ভারতের অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ যা গত দশকে হিমবাহ গলনের ঘটনাকে আগের তুলনায় 65% ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে "জীবাশ্ম জ্বালানি যুগের" অবসান ঘটানো জরুরি, নাহলে হিমবাহের গলনের ফলে হ্রদ এবং নদীগুলি ফুলে উঠতে পারে, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনবসতি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের পরিস্থিতিও সমানভাবে ভয়াবহ, বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বহু-উষ্ণায়নের কারণে শতাব্দীর শেষের দিকে 75% পর্যন্ত হিমবাহ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বিপজ্জনক বন্যা এবং পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দেবে, যা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আনুমানিক 24 কোটি মানুষকে প্রভাবিত করবে। এভারেস্ট থেকে ফিরে আসা পর্বতারোহীরা জানিয়েছেন, পর্বতটি আগের চেয়ে শুষ্ক এবং ধূসর দেখায়। গুতেরেস রেকর্ড তাপমাত্রা এবং রেকর্ড হিমবাহ গলানোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে জোর দিয়ে বলেছেন, মাত্র 30 বছরের কাছাকাছি সময়ে নেপাল তার বরফের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব জলবায়ু বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ঠেকাতে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। ●

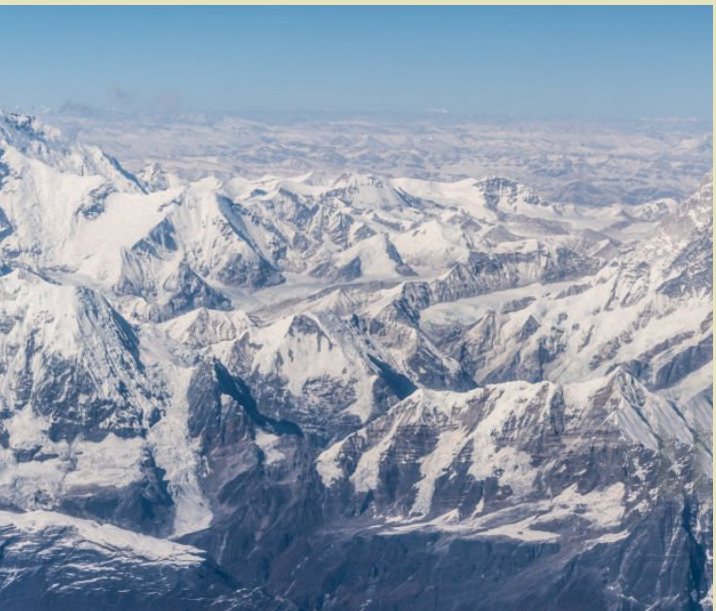

একটি গ্রহের চেয়েও বড় এই চাঁদের পৃষ্ঠে রয়েছে লবণ

নাসার জুনো মিশন বৃহস্পতির বৃহত্তম চাঁদ গ্যানিমিডে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে। মহাকাশযানের জোভিয়ান ইনফ্রারেড অরোরাল ম্যাপার (জিআইআরএএম) স্পেকট্রোমিটার গ্যানিমিডের কাছাকাছি উড়ে যাওয়ার সময় এর পৃষ্ঠে খনিজ লবণ এবং জৈব যৌগ সনাক্ত করেছে। *নেচার অ্যাস্ট্রোনমি*-তে প্রকাশিত এই অনুসন্ধানটির থেকে গ্যানিমিডের রচনা এবং বরফের ভূত্বকের নীচে এর লুকানো সমুদ্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আমরা জানতে পারি। উপগ্রহ হলেও গ্যানিমিড আকারে বুধ গ্রহের চেয়ে বড়। এর অভ্যন্তরীণ গঠন ও এর পৃষ্ঠে সমুদ্রের উপস্থিতি দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের কৌতুহলের বিষয়। নাসার গ্যালিলিও মহাকাশযান এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণগুলিতে গ্যানিমিডের পৃষ্ঠে লবণ এবং জৈব পদার্থের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু যথেষ্ট রেজোলিউশনের অভাবে সেই প্রমান চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়নি। ইতালির রোমের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিজ্ঞানী ও জুনোর অন্যতম গবেষক ফেদেরিকো টোসির মতে অ্যামোনিয়েটেড লবণের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে গ্যানিমিডের গঠনের সময় অ্যামোনিয়া ঘনীভূত করার জন্য যথেষ্ট শীতল উপাদান ছিল। কার্বনেট লবণ কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ বরফের অবশিষ্টাংশও হতে পারে। আশ্চর্য বিষয় হল, বৃহস্পতির তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে সুরক্ষিত এই উপগ্রহের নির্দিষ্ট অক্ষাংশে অন্ধকার এবং উজ্জ্বল উভয় পৃষ্ঠেই লবণ এবং জৈব পদার্থের সর্বোচ্চ প্রাচুর্য পাওয়া গেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে শনাক্ত হওয়া উপাদানগুলি একটি গভীর সমুদ্রের ব্রাইনের অবশিষ্টাংশ হতে পারে যা এই উপগ্রহের হিমায়িত পৃষ্ঠে মজুদ ছিল।

অন্ধকার দিনগুলিতে ডাইনোসররা যেভাবে অবলুপ্ত হয়েছিলো

প্রায় 660 লক্ষ বছর আগে একটি বিশাল গ্রহাণু মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে আঘাত করেছিল, যার ফলে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়। এই বিপর্যয়কেই ডাইনোসর যুগের সমাপ্তির কারণ বলে মনে করা হয়। একটি সাম্প্রতিক গবেষণা এই বিপর্যয়মূলক ঘটনাটির উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে। এই ঘটনার প্রভাবে অবিলম্বে দাবানল, ভূমিকম্প, বাতাসে তীব্র তরঙ্গ এবং সমুদ্রে বিশাল ঢেউ উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিধ্বংসী আঘাত ছিল পরবর্তী জলবায়ু বিপর্যয়। মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তাপমাত্রা নাটকীয়ভাবে কমে যায়। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ করেছেন যে বিপর্যয় স্থানের পাল্ভারাইজড শিলা থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধূলিকণা নির্গত হয় যা ছিল এই জীবকূল বিলুপ্তির প্রধান কারণ। এই ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলে দম বন্ধ করা পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং এবং সূর্যালোককে ঢেকে দেয়, ফলে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়। বন্ধ হয়ে যায় জীবনধারণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। গবেষকরা দেখেছেন যে মোট ধূলিকণার পরিমাণ ছিল প্রায় 2,000 গিগাটন যা মাউন্ট এভারেস্টের ওজনের 11 গুণ বেশি। বিজ্ঞানীরা তানিস নামক উত্তর ডাকোটা প্যালিওন্টোলজিকাল ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত পলির উপর ভিত্তি করে যে প্যালিওক্লাইমেট সিমুলেশন পরীক্ষা করেন তাতে দেখা যায় যে এই সূক্ষ্ম দানাযুক্ত ধুলো বায়ুমণ্ডলকে অস্বচ্ছ করে সূর্যালোকের প্রবেশ বন্ধ করে দুই বছর পর্যন্ত সালোকসংশ্লেষণকে অবরুদ্ধ করতে পারে। বেলজিয়ামের রয়্যাল অবজারভেটরি এবং ব্রাসেলের ভ্রিজ ইউনিভার্সিটির গ্রহ বিজ্ঞানী সেম বার্ক সেনেলের মতে এই ধুলাস্তর 15 বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে ছিল। পূর্ববর্তী গবেষণায় দাবানলের প্রভাব এবং নির্গত কার্বন ও সালফারের ভূমিকা এই ধ্বংসের প্রধান কারণ মনে করা হলেও এই গবেষণাটি ইঙ্গিত করেছে যে বায়ুমণ্ডলে বিস্তৃত এই ধূলিকণার স্তরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই ধূলিকণা বিশ্বব্যাপী একটি মেঘের স্তর তৈরি করে যা বছরের পর বছর ধরে থাকার ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়। 6–9 মাইল প্রশস্ত আনুমানিক গ্রহাণুর প্রভাবের পরে, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা হ্রাস এবং প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে ভেঙে পরে খাদ্যশৃঙ্খল। ফলে সেই যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণী ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

টিকার নেপথ্যের মৌলিক গবেষণা পেল নোবেল স্বীকৃতি

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

আমাদের দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে দেহজ প্রতিরক্ষায় অর্থাৎ ইমিউনিটিতে নিযুক্ত কিছু কোষ দিনরাত কাজ করে চলেছে। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এরা 'শত্রু-মিত্র' চেনার কাজে সিদ্ধহস্ত। এরা পরিবেশ থেকে দেহে প্রবেশ করা ক্ষতিকারক জৈব উপাদানকে শত্রু হিসেবে এবং দেহের নিজস্ব জৈব উপাদানকে মিত্র হিসাবে বুঝতে পারে। আর এই চেনা-বোঝার কাজে তাদের সাহায্য করে কোষের বাইরে বেরিয়ে থাকা কিছু রিসেপ্টর বা সংবেদন গ্রাহক অণু।

জন্মগতভাবে আমাদের দেহের কিছু উপাদান (কোষ ও জৈব-অণু) প্রতিরক্ষার কাজে যুক্ত রয়েছে। যেমন— নিউট্রোফিল, ম্যাক্রোফাজ, ন্যাচারাল কিলার সেল এর মত কিছুকোষ এবং লাইসোজাইম, সি-রিয়্যাক্টিভ প্রোটিন, ডিফেন্সিন-এর মতো কিছু জৈব-অণু। এরা গড়ে তুলেছে দেহজ প্রতিরক্ষার একটি স্তম্ভ—ইননেট ইমিউনিটি বা সহজাত সুরক্ষা ব্যবস্থা। যেকোনো ধরনের বহিঃশত্রুর হাত থেকে শরীরকে বাঁচাতে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে দেহের দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষার জন্য জন্মের পর কিছু কোষকে শরীর তৈরি করে নেয়। মূলতঃ এরা লিম্ফোসাইট নামক রক্তকোষ, যারা থাইমাস ও অস্থিমজ্জার মত দেহের কিছু অঙ্গে ট্রেনিং নিয়ে বহিঃশত্রু মোকাবিলায় কার্যকরী হয়ে ওঠে এবং কোষীয় তৎপরতায় বা অ্যান্টিবডির মতো জৈব-অণুর মাধ্যমে শত্রু-নিকেষে রত হয়। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে, এই লিম্ফোসাইটদের একভাগ লিম্ফয়েড টিস্যুতে 'স্মৃতিকোষ' হিসাবে গচ্ছিত থাকে এবং শত্রুর দ্বিতীয়বার আগমনে তেড়েফুঁড়ে এর মোকাবিলায় নেমে পড়ে। এই ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে 'অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি' বা আহৃত প্রতিরক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে, ইননেট ও অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরঞ্চ যোগাযোগ রেখে, শত্রুবিনাশে কাজ করে। এদের পারস্পরিক যোগাযোগের সূত্র হচ্ছে এক ধরনের কোষের কার্যকলাপ। এদের নাম হলো ডেনড্রাইটিক কোষ। এদের গায়ে এক ধরনের রিসেপ্টর থাকে। এরা শত্রু জৈব-অণুর একটি বিশেষ প্যাটার্ন বা রূপকে চেনার কাজে নিযুক্ত। তাই এদের বলে প্যাটার্ন-রেকগনিশন রিসেপ্টর।

টোল-লাইক রিসেপ্টর, রিগ-লাইক রিসেপ্টর, নড্ লাইক রিসেপ্টর- এইরকম বিভিন্ন রিসেপ্টর ছড়িয়ে আছে কোষের পর্দায় বা কোষের ভিতরে এন্ডোসোম নামক থলিতে (চিত্র-১)। এদের মধ্যে টোল-লাইক রিসেপ্টর (সংক্ষেপে, টিএলআর) অন্যতম। এই রিসেপ্টরটি লিউসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ একটি পলিপেপটাইড-এর দণ্ডকার কাঠামো, যার এক প্রান্তে রয়েছে সিস্টিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের আধিক্য এবং একেবারে ভেতরের দিকে টোল/ ইন্টার-লিউকিন রিসেপ্টর ডোমেইন বা বিশেষ অংশ (চিত্র -২)।

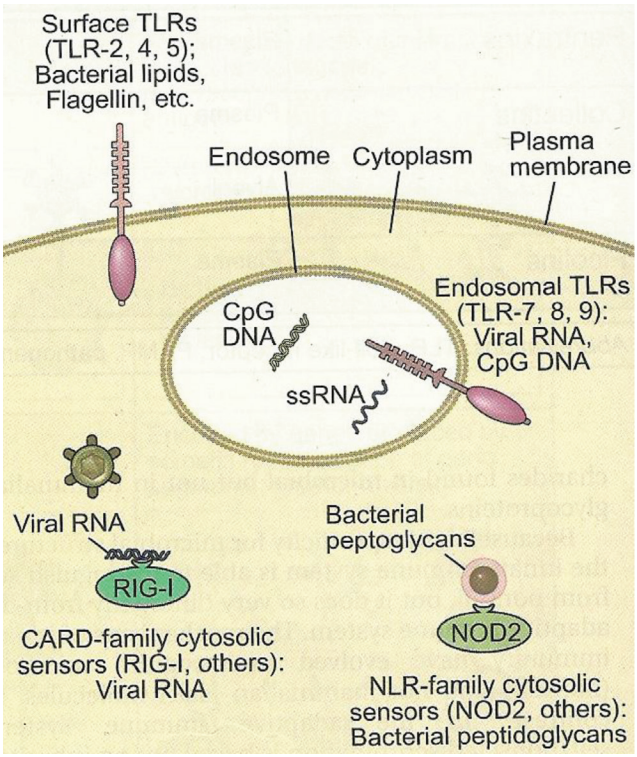

চিত্র-১: কোষের পর্দায় বা কোষের ভিতরে টোল-লাইক রিসেপ্টর, রিগ-লাইক রিসেপ্টর, নড্ লাইক রিসেপ্টর

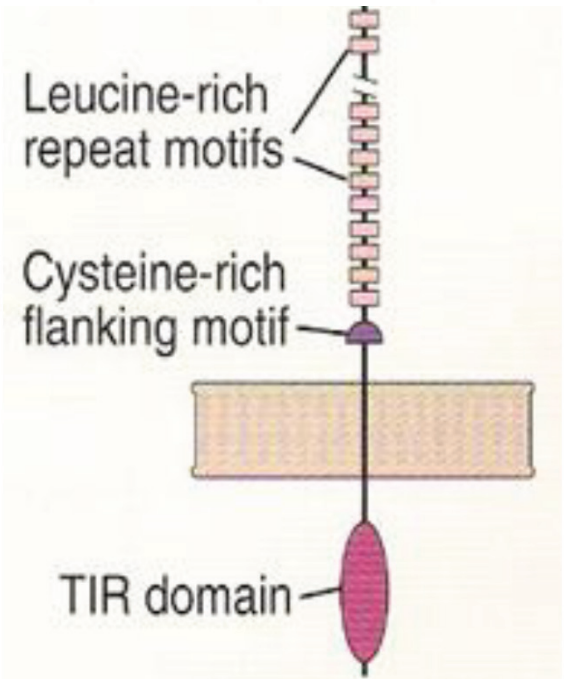

চিত্র-২: টোল-লাইক রিসেপ্টর

ট্রানজিস্টার রেডিওর এন্টেনার মত কিছু টিএলআর (-1, -2, -4, -5 ও -6) কোষ-পর্দায় গাঁথা থাকে; আর কিছু টিএলআর (-3, -7, -8, -9) থাকে এন্ডোসোমে (চিত্র-৩)। কোষের ভিতরে এন্ডোসোমে থাকা টিএলআর গুলো শত্রুদের (পড়ুন, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক,পরজীবীর) ডিএনএ (ডি-অক্সি রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড) এবং আরএনএ (রাইবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড) কে চেনার কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলত টিএলআর–3 চিনতে পারে ভাইরাসের দ্বিতন্ত্রী আরএনএ এবং দেহ-কোষের মেসেঞ্জার-আরএনএ (এম-আরএনএ)-কে। টিএলআর-7 ও -8, ভাইরাসের দেহের অথবা কৃত্রিমভাবে তৈরি একতন্ত্রী আরএনএকে সহজেই চিনতে পারে। এই সমস্ত কিছুই বিগত তিন দশকের গবেষণায় জানা গেছে। গবেষণায় এও উঠে এসেছে, আরএনএর কোন অংশটা চেনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ। ভাইরাসের একতন্ত্রী আরএনএ সজ্জা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এর অন্যতম উপাদান ইউরাসিলের আধিক্য রিসেপ্টরকে উদ্দিপ্ত করতে সাহায্য করে। যদিও পরে বোঝা যায়, এমনটা সবসময় যে হবেই তাও নয়। আসলে, আরএনএ কোষ পর্দার মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকায় তা এন্ডোসোমের মধ্যে থাকা টিএলআর-3, -7 এবং -8 এর সংস্পর্শে না এলে সেটা কোষীয় উদ্দীপনা তৈরি করতে পারে

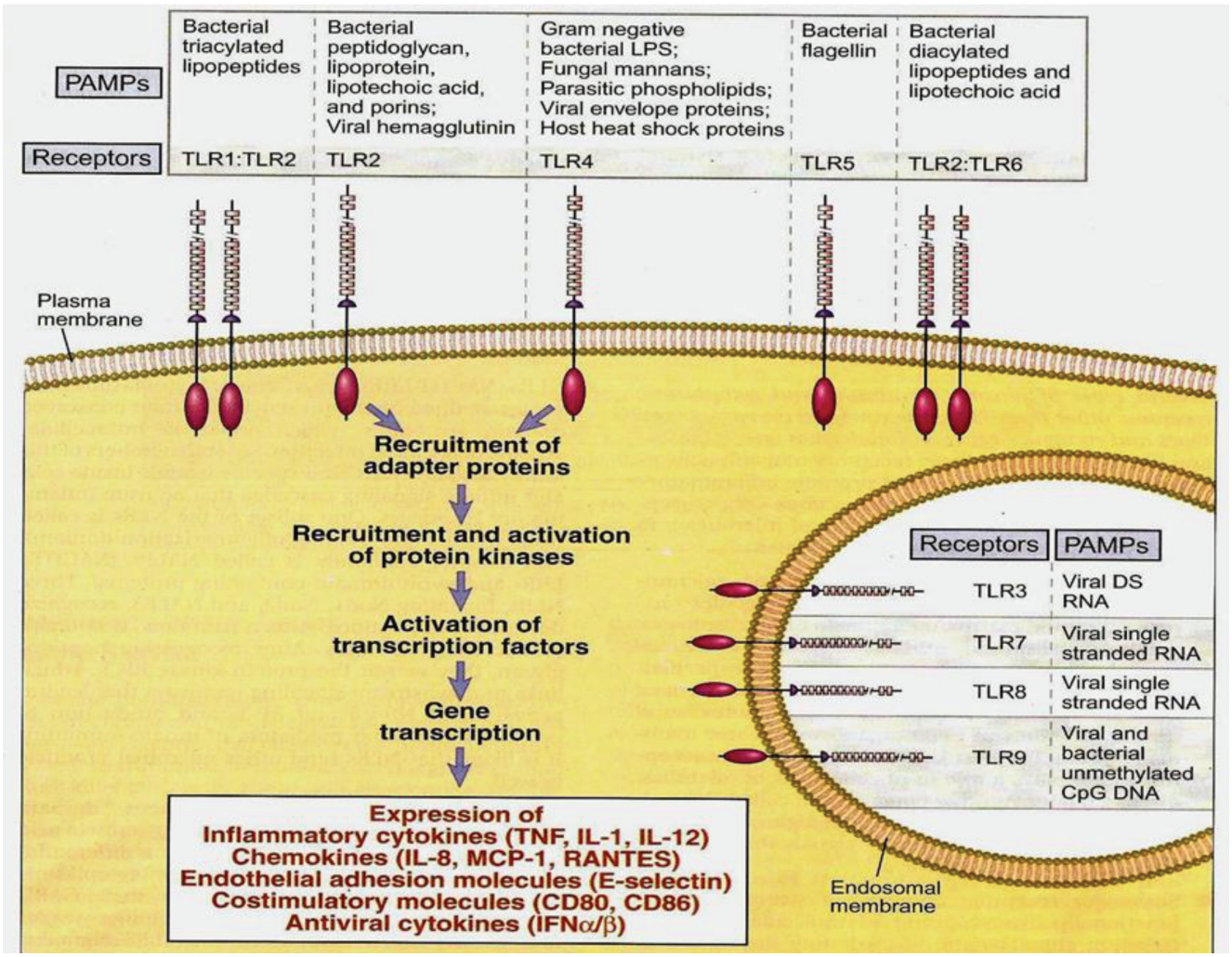

চিত্র-৩: কোষের পর্দায় বা কোষের ভিতরে বিভিন্ন টোল-লাইক রিসেপ্টর

কাতালিন ক্যারিকো

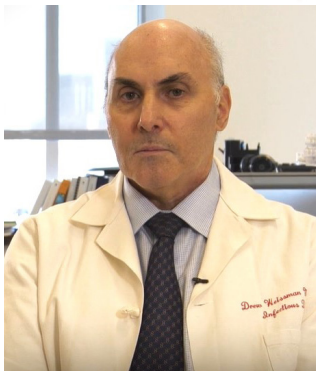

ড্রিউ ওয়াইসম্যান

না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, একতন্ত্রী আরএনএ-তে মিথাইল গ্রুপ যুক্ত থাকলে (মিথাইলেটেড হ'লে) সেই আরএনএ কোষে উদ্দীপনা তৈরি করতে পারে না। উল্টোদিকে, জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) ও ভাইরাসের আরএনএ 'মিথাইলেটেড' নয় বলে, টিএলআর এদের শত্রু জৈব-অণু মনে করে এবং কোষীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এর জেরে হয় তীব্র কোষীয় প্রতিক্রিয়া এবং কোষীয় রস সাইটোকাইনের নিঃসরণ। পরিণতি-প্রদাহ সৃষ্টি বা ইনফ্লামেশন।

ঠিক দুই দশক আগে (2003–04 সাল নাগাদ) দুইজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম আরএনএ নিয়ে গবেষণা করার সময় লক্ষ করেন, ডেনড্রাইটিক কোষে অবস্থিত টিএলআর -3, -7, -8 এই কৃত্রিম আরএনএ কে সাইটোকাইন (বিশেষতঃ ইন্টারলিউকিন -8 নামক কেমোকাইন) নিঃসরণ ক'রে শরীরের প্রদাহ তৈরি করছে। অথচ এই ধরনের আরএনএ অণুর উপাদানে সামান্য পরিবর্তনই ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি করছে। টিএলআর এদের বহিঃশত্রু হিসেবে মনে করছে না। ফলে কোষীয় বিক্রিয়া হচ্ছে না। আরএনএ (রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড) এর মূল উপাদান নিউক্লিওসাইডের পরিবর্তন এনে যদি মিথাইল এডিনোসিন, মিথাইল সাইটিডিন, থাইয়োইউরিডিন, সিউডোইউরিডিন করা যায়, তবে প্রদাহ এড়ানো সম্ভব হবে; পাশাপাশি কৃত্রিম মেসেঞ্জার আরএনএ শরীরে প্রবেশ করিয়ে কোষের 'মেশিনারি'কে কাজে লাগিয়ে অভীষ্ট প্রোটিন তৈরি করানো যাবে। এভাবে শরীরের 'মডিফাইড কৃত্রিম মেসেঞ্জার আরএনএ- র সফল প্রয়োগ আরএনএ থেরাপি গবেষণায় এক নতুন দিশা দেখায়।

নব্বই দশকের গোড়ায় হাঙ্গেরিয় বিজ্ঞানী (বায়োকেমিস্ট) কাতালিন ক্যারিকো আরএন এর ব্যবহারিক দিক নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, আরএনএকে চিকিৎসা বা থেরাপির কাজে লাগানো। এম-আরএনএ দিয়ে ভ্যাকসিন বা এডজুভেন্ট তৈরি করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কাজে তিনি কিছুতেই সফল হচ্ছিলেন না। এই সময় হঠাৎই জেরক্সের দোকানে গবেষণার ম্যানুস্ক্রিপ্ট জেরক্স করানোর সময় আলাপ হয় মার্কিন বিজ্ঞানী (ইমিউনোলজিস্ট) ড্রিউ ওয়াইসম্যানের সঙ্গে।

ওয়াইসম্যান ডেনড্রাইটিক কোষকে কাজে লাগিয়ে এইচআইভি ভাইরাসের আরএনএ-র আদলে কৃত্রিম এম-আরএনএ বানিয়ে একটি কার্যকরী ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সফলতা আসছিল না। কৃত্রিম আরএনএকে ডেনড্রাইটিক কোষ, ল্যাবরেটরীতে (সেল কালচারে), টিএলআর কে ব্যবহার করে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং প্রদাহ সৃষ্টিকারী রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। দুই বিজ্ঞানীর কাজের ক্ষেত্র যখন একই, আরএনএ এবং ইমিউনিটি, তখন পরস্পরের গবেষণার সহযোগী হয়ে ওঠা ছিল কবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

যৌথ গবেষণার সুবাদে তারা দুই দশক আগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। কৃত্রিম এম-আরএনকে সামান্য পরিবর্তন (পড়ুন, 'মডিফাই') করে প্রতিরক্ষা কোষ প্রভাবিত করার যে প্রযুক্তি তাঁরা মৌলিক গবেষণায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তা পরে আরএনএ ভ্যাকসিন তথা আরএন এ অ্যাডজুভেন্ট ব্যবহারের পথ সুগম করে। আর এর হাত ধরেই আসে এম-আরএনএ ভ্যাকসিনের উদ্ভাবন ও সফল প্রয়োগ। কোভিড অতিমারি কালে তাঁদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই এত দ্রুত এম-আরএনএ ভ্যাকসিন উৎপাদন শুরু হয় ও বাজারে আসে। মর্ডানা ও ফাইজার-বায়োএনটেক-এর এম-আরএনএ ভ্যাকসিনের কথা এখন আমরা সকলেই জানি।

কৃত্রিম এম-আরএনকে সামান্য পরিবর্তন (পড়ুন, 'মডিফাই') করে প্রতিরক্ষা কোষ প্রভাবিত করার যে প্রযুক্তি তাঁরা মৌলিক গবেষণায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তা পরে আরএনএ ভ্যাকসিন তথা আরএন এ অ্যাডজুভেন্ট ব্যবহারের পথ সুগম করে।

কারিকো ও ওয়াইসম্যানের যুগান্তরকারী মৌলিক গবেষণার কাজকে স্বীকৃতি দিতে সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট এবছরের চিকিৎসা বিজ্ঞান/শারীরবিদ্যা শাখায় নোবেল পুরস্কারের প্রাপক হিসাবে এই দুই বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করেছে।

শরীরে এম-আরএনএ ভ্যাকসিনটির কার্যকারিতা এবং সার্বিক উপকারিতা তথা সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে শেষ কথা বলার সময় সম্ভবত এখনো আসেনি। তবে আরএনএ ভিত্তিক ইমিউনিটি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা যে চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা মানব কল্যাণে ভবিষ্যতে কাজে আসবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ●

লেখক ***ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার*** *পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। ইমেল: joardar69@gmail.com*

করতলে মহাকাশ

পার্থ পাল

বহুকাল আগে উত্তাল সমুদ্রের তীরে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন মানুষ। কী রয়েছে ওই বিপুল জলরাশির শেষে! জানতেন না তাঁরা। তা বলে তাঁরা থেমে থাকেননি। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বেড়িয়ে পড়েছিলেন অজানাকে জানতে। তাই আবিষ্কৃত হয়েছে দেশ, মহাদেশ, সমগ্র পৃথিবী।

ইউরি গ্যাগারিন

তেমনই আমাদের মাথার উপরে রয়েছে বহুস্তরী বায়ু-সমুদ্র। তার উপরে অসীম শূন্যতা আর গ্রহ,নক্ষত্র, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, নীহারিকা, নক্ষত্রমন্ডলী, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি। এই গ্রহের উন্নততম জীব মানুষ এসব দেখেই কেবল ক্ষান্ত থাকেনি। অসীম জিজ্ঞাসা আর ক্রমোন্নত বিজ্ঞানকে পাথেয় করে তাঁরা জয় করেছে মহাকাশকেও!

এ জয় যাত্রার সূচনা হয়েছিল এখন থেকে বাষট্টি বছর আগে। 1961 সালের 12ই এপ্রিল রাশিয়ার এক চাষীর ছেলে ইউরি গ্যাগারিন 'ভস্তক' মহাকাশযানে চড়ে গিয়েছিলেন মহাকাশে। তারপর পৃথিবীর চারপাশে এক পাক ঘুরে প্যারাসুটে চেপে সশরীরে নেমে এসেছিলেন মাটিতে। পাঁচ টন ভরের এই ভস্তক-চালিত অভিযান মানব সভ্যতাকে জুগিয়ে ছিল আকাশ জয়ের আত্মবিশ্বাস।

সেই বলে বলিয়ান হয়ে অপর অভিযাত্রী—টিটড আরো বেশিক্ষণের জন্য ছিলেন মহাকাশে। সেখানে তিনি একদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেন। এমনকি পরীক্ষামূলকভাবে খাওয়া-দাওয়া করেন, ঘুমোনও। পিছিয়ে থাকলেন না মহিলারাও। প্রথম মহিলা মহাকাশচারী হিসেবে রাশিয়ার ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা একবার নয়, গুনে গুনে 48 বার পাক খেলেন এই সুন্দর নীল গ্রহটিকে। ভ্যালেন্তিনার আকাশ জয়ের পরের বছর অর্থাৎ 1964 সালে মহাকাশে গেলেন এক ডাক্তারবাবু। নাম, বোরিশ ইয়েগরাফ। তার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ভারশূন্য অবস্থায় মানব দেহে কী কী প্রভাব পড়ে তা জানা। ডাক্তারবাবুর থেকে আশ্বাস পেয়ে আরো সাহসী হলেন মহাকাশচারীরা। তাই 'জেমিনি' মহাকাশযানে চড়ে শূন্যে গিয়ে বেশ কয়েক পা হেঁটে নিলেন দুই আমেরিকান আকাশজয়ী—জেমস ম্যাকডিভিট ও এডওয়ার্ড হোয়াইট।

চাঁদের মাটিতে নীল আমস্ট্রং

হাঁটা শিখে গেলে যেমন শিশুরা দৌড়াতে শুরু করে, তেমনই আমেরিকান মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' এরপরই সৃষ্টি করলো ইতিহাস। তাদের উদ্‌যোগে মানুষের পা পড়ল চাঁদের মাটিতে! 1969 সালের 20 জুলাই আন্তর্জাতিক সময় রাত্রি 10:56 মিনিটে নীল আর্মস্ট্রং ছুঁলেন চাঁদের মাটি। "That's one small step for man, one giant leap for mankind." আর্মস্ট্রং এর বলা এই বিখ্যাত বাক্যটি মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। মানব সভ্যতা লাফিয়ে এগিয়ে গেল অ-নে-কটা।

1986 সালে রাশিয়া তৈরি করল 'মির' মহাকাশ স্টেশন। যা হল আকাশে ভেসে বেড়ানো মানুষের ঠেক। মহাকাশচারীরা সেখানে গেলেন আবার স্পেস শার্টলে বা মহাকাশফেরিতে ফিরেও এলেন। শেষমেষ আর্থিক অনটনের কারণে 2001 সালে সেটিকে ভেঙে ফেলা হলো। ভাঙ্গা টুকরোগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো প্রশান্ত মহাসাগরে।

ঠিক তার পরের বছরই আঠারোটি দেশের যৌথ উদ্যোগে চালু হয়ে গেল আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র। 2002 সালের 2 নভেম্বর থেকে এটির একটি সিটও খালি নেই। মহাকাশচারীরা এখানে ওজনশূন্য অবস্থায় খান, ঘুমোন, ব্যায়াম করেন; মজাও করেন। এবং নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেন পৃথিবীস্থিত নিয়ন্ত্রক কক্ষের সঙ্গে। এখানেই চলে কঠিন কঠিন গবেষণাও।

স্পেস স্টেশনে ভাসমান বিজ্ঞানী

সুনীতা উইলিয়ামস

ভাসমান এ আকাশবাড়িতে টানা 195 দিন বসবাস করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামস। আবার এখানে গবেষণা করে ফেরার পথেই যান্ত্রিক গোলযোগে 2003 সালের 1 ফেব্রুয়ারি সহযাত্রীদের সঙ্গে আকাশে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন অপর ভারত-গর্ব কল্পনা চাওলা।

তাতে মহাকাশ অভিযান সাময়িক ধাক্কা খেয়েছে। তারপর ভুল শুধরে আবারও শুরু হয়েছে নব নব মহাকাশ রহস্য উদঘাটনের কাজ। চাঁদে মনুষ্য বসতি স্থাপনের ভাবনা এখন বাস্তবায়নের পথে। আগামী দশ বছরের মধ্যেই মঙ্গলের লাল মাটিতে হেঁটে বেড়াবে মানুষ। তার জন্য 'অরিয়ন' মহাকাশযান সেজেগুজে তৈরি। তৈরি রয়েছেন তার আরোহী মহাকাশচারিনীও।

কল্পনা চাওলা

পায়ের নীচে পৃথিবী

এত অভিযান, এত ব্যয় কেবল বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য নয়। হিসাব বলছে, মহাকাশে যার যত বেশি দখল, সেই দেশ তত বেশি সফল, সমৃদ্ধ। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে জিপিএস, বিমান চলাচল, বেতার দূরদর্শন সম্প্রচার, মোবাইল যোগাযোগ ইত্যাদি হাজারো সুবিধা ভোগ করা যায়। সেগুলির সাহায্য ছাড়া বর্তমান বিশ্ব অচল। এছাড়াও মহাকাশ পর্যটন, গ্রহানুর বুক থেকে প্লাটিনামের মতো মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ, সৌরঝড়ের মোকাবিলা করে প্রচুর মুনাফা আসার সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে। তাই বিভিন্ন ধনকুবের ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মহাকাশ ব্যবসায়। ভারতেই একটি অ-সরকারী সংস্থার উদ্‌যোগে 'বিক্রম এস' নামের মহাকাশযান উৎক্ষেপিত হল কিছুদিন আগে। চাঁদ থেকে মাটি এনে বিক্রির কথাও ভাবছেন কেউ কেউ।

এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে ভয় ছেড়ে মানুষের মহাকাশে পৌঁছানোর সাহস থেকেই। সেই ইউরি গ্যাগারিনের অভিযানের ঘটনাকে স্মরণে রেখেই 2011 সাল থেকে প্রতি বছর 12 এপ্রিল দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মানব মহাকাশযাত্রা দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। এই দিনটি সেই হিসাবে, অসীমকে সীমার মাঝে বেঁধে ফেলার শপথ গ্রহণের দিন।

*লেখক **শ্রী পার্থ পাল** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: tukaipartha@gmail.com

ওরিওন মহাকাশযান

মহাকালের আশ্রয়ে উদয়কাল

অমর কুমার নায়ক

উদয়কাল নামের সাপ, আমাদের এই অঞ্চলে যে পাওয়া যায় সেকথা জানা ছিলনা। যদিও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সরীসৃপদের তালিকায় এর নাম আছে অনেক আগে থেকেই। এ সাপের যে দেখা পাব আর ছবি তুলব তাও আশাতীত ছিল। তবে হটাৎ করেই সাপটাকে দেখার সৌভাগ্য হয়ে গেল ভাই সত্যজিৎ মন্ডলের দৌলতে। ওর সঙ্গে মাধাইগঞ্জের জঙ্গলে গিয়েছিলাম সেখানকার পাখি আর বন্য জন্তুদের সাথে আলাপ জমাব বলে। ওখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্যজিৎ জানালো ও একটা 'কমন কুকরি' সাপ এনেছে, তার আগের রাতে উদ্ধার করে। জঙ্গলে ঢুকেই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ইন্ডিয়ান থিকনি, তার ছবি তোলার পর বেলা বাড়ার আগেই একটা উইঢিবির কাছে ছাড়া হল সাপটাকে। আমি আর অয়ন ছবি আর ভিডিও করলাম কিছু। সাপটাকে ছাড়ার কিছুক্ষণ জায়গাটা চিনে নিয়ে, কয়েকশো গাছের ঘেরাটোপের মধ্যে বিশাল মহাকাশের নীচে যেন 'মহাকালের' আশ্রয়ে আমাদের চোখের সামনে হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। হয়ত কোনদিন দেখা হবে হটাৎ করেই। ততদিনে নিশ্চয় সে আরও বড় হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে কী চিনতে পারবে আদেউ!

উদয়কাল নামের মধ্যে 'কাল' শব্দটা থাকলেও সাপটা প্রকৃত পক্ষে বেশ নিরীহ প্রকৃতির এবং সম্পূর্ণ নির্বিষ এক প্রজাতির সাপ এরা। কামড় দেওয়ার প্রবৃত্তি নেই এদের মধ্যে। ভয় পেলে বা কোন কারণে উত্তেজিত হলে শরীর শক্ত করে ঝাঁকুনি দেয়। এরা ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে বেশ পছন্দ করে। উইঢিবি, গাছের কোটর, গর্ত, পাথরের খাঁজ বা কোন পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে থাকে। সাধারণত গোধুলি লগ্নে বা রাতের দিকে এরা সক্রিয় হয়। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের শেষ প্রান্ত ছাড়া সর্বত্র এদের দেখা মেলে। ভারত ছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কাতে পাওয়া যায় এদের। কলুব্রিডি পরিবারের অন্তর্গত এই সাপটির দুটি ইংরাজি নাম প্রচলিত— 'কমন কুকরি স্নেক' এবং 'ব্যান্ডেড কুকরি স্নেক'; বিজ্ঞান সম্মত নাম *অলিগোডন আর্নেনসিস*।

পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গড় দৈর্ঘ্য 35 সেমি. এবং সর্বাধিক আকার 70 সেমি. হলেও শিশু অবস্থায় মাত্র 8 সেমি. হয়। এদের ধারালো এবং সূচালো দাঁতগুলি নেপালি অস্ত্র কুকরির মতোই, সেই থেকে এরূপ নামকরণ। মাথা, গলার তুলনায় বেশী চওড়া হয়না। লেজ আকারে ছোট এবং প্রান্তদেশ সূচালো হয়ে থাকে। দেহের আঁশগুলি মসৃণ। দেহের উপরিতলের রং হলদেটে বাদামি, কালচে বাদামি বা ফিকে বাদামি হয়। সারা দেহে প্রায় 10–20টি কালো বা গাঢ় বাদামি রঙের পটি দেখা যায়। এই পটিগুলি সব জায়গায় সমান চওড়া হয়না। চোখের পাশ থেকে গলা অবধি মোট তিনটি সুস্পষ্ট উল্টানো ভি 'Λ' দেখা যায় কালো বা গাঢ় বাদামি রঙের। এদের পেট উজ্জ্বল সাদা রঙের হয়। চোখের তারার রং কালো এবং চোখ গোলাকার। এরা বছরের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে 3–9টি ডিম পাড়ে। স্থান ভেদে এই ডিম পাড়ার সময়ে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শিশু অবস্থায় এরা পোকামাকড়, পোকার লার্ভা, মাকড়সা, টিকটিকির ডিম খেয়ে থাকে। বড়রা বিভিন্ন সরীসৃপের ডিম, পাখির বাচ্চা, ছোট পাখি, পাখির ডিম, টিকটিকি, অঞ্জনি এবং নেংটি ইঁদুর খেয়ে থাকে। এইভাবে এরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

আগে গ্রামাঞ্চলে বেশ ভালোই দেখা পাওয়া গেলেও আজকাল আর তেমন দেখতে পাওয়া যায়না। এর মূল কারণ এদের বাসস্থানের থেকে আমাদের দূরত্ব, নিশাচর স্বভাব এবং এদের লাজুক প্রকৃতি। এরা নিরীহ এবং নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির হওয়ার কারণে ঝামেলা এড়িয়ে চলে। কিন্তু বর্তমানে এদের বাসস্থানের অভাব এবং প্রাকৃতিক খাদ্যতেও ভাঁটা পড়া এদের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। এরা ভারতীয় বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন (1972) এর চতুর্থ তপশিলে সংরক্ষিত প্রজাতি। আন্তর্জাতিক সংস্থা IUCN এর লাল তালিকা অনুযায়ী এরা বিপদ মুক্ত তালিকায় আছে এবং এদের সংখ্যা (বিশ্বব্যাপী) স্থিতিশীল। তবে একটি সমস্যা আছে এই সাপ সম্পর্কে মানুষের তেমনটা জানা না থাকা এবং সামগ্রিক ভাবে সাপের প্রতি মানুষের ভয়ের কারণে এরা মাঝে মধ্যে যদি মানুষের সামনে আসে তবে মৃত্যু অবধারিত। এছাড়াও এদের সাথে তীব্র বিষাক্ত ব্যান্ডেড ক্রেইট সাপের কিছু মিল মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক ঘটাতে পারে। সেই কারণে এদের সম্পর্কে জনমানসে বিস্তারিত প্রচার প্রয়োজন। তাহলে হয়ত আগামী দিনে আমাদের জঙ্গলে ছাড়া সাপটির সাথে আমার আবারও সুসাক্ষাৎ হতে পারে।

*লেখক **শ্রী অমর কুমার নায়ক** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com*

ম্যাক্সওয়েল ও তড়িৎচুম্বকত্ব

শামীম হক মণ্ডল

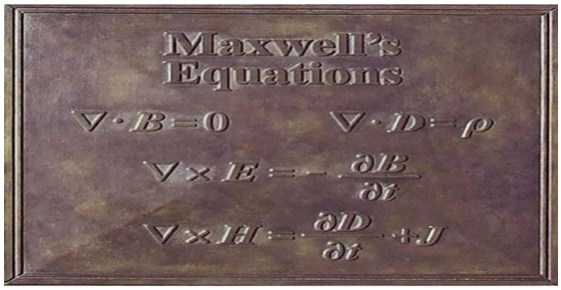

"Was it a god who wrote these lines?"
—Boltzman

কোনো বস্তুকে হাল্কা বা জোরে ধাক্কা দিলে তার গতিপথ কেমন হবে—নিউটনের আগপর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ভাবে কেউ ঠাওর করতে পারেন নি। তাঁর গতিসূত্রের পালকিতে ভর করে আপামর বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা অবলীলায় কষতে পারেন বস্তু জগতের গতীয় হিসাব-নিকাশ। সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল অতিক্রান্ত দূরত্ব অর্থাৎ বেগ, তাকে ভর দিয়ে গুণ করে ভরবেগ, তাকে আবার বেগ দিয়ে গুণ করে শক্তির গণনা—একজন হাইস্কুল-ছাত্রের রোজকারের রুটিন। কারো মনে হতেই পারে, এর জন্যেই নিউটন এতো বিখ্যাত?! তাঁর এতো নামডাক?! না আজ যেটা উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিশেষ সেই আইডিয়া (যা দিয়ে ছোট একটা খেলনা গাড়ি থেকে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি সাহজেই নির্ধারণ করা যায়) নিউটন ছাড়া তাঁর আগে জগতে আর কেউ দিতে পারেননি—তাই তিনি কিংবদন্তী। মাথা আঁচড়ানোর পর চিরুনি কেনো কাগজের টুকরোকে টানে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষজন পদার্থবিজ্ঞানের আর এক বিস্ময়কর জগতের সাথে পরিচিত হয়—যার পোশাকি নাম ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্স বা স্থিরতড়িৎ বিজ্ঞান। যার মূল বিষয় হচ্ছে আধান ও তাদের মধ্যকার ক্রিয়াকলাপ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আধান কি? সোজা কথায় বললে যার উপস্থিতি বা অনুপুস্থিতির কারণে দুটি বস্তু পরস্পরকে নিজেদের দিকে টানে বা দুরে ঠেলে দেয়। এরাই গতিশীল হলে জন্ম দেয় তড়িৎপ্রবাহ বা কারেন্টের। সেই তড়িৎ প্রবাহই আবার সৃষ্টি করে চুম্বকত্বের। পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় যাকে বলে 'ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স'। এই দুই উপশাখার সংমিশ্রনে তৈরী হয় পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিসম' বা 'তড়িৎচুম্বকত্ব'। এর ওপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পৃথিবীবিখ্যাত কিছু দিকপাল দের কাজকে কিছুটা পরিমার্জন করে যিনি একই ছাতার তলায় এনেছিলেন—তিনিই ম্যাক্সওয়েল। যাঁর মেধা ও প্রজ্ঞার ছোঁয়ায় উনিবিংশ শতকের শেষদিকে ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞান এক লহমায় কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলো। কোনো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ছাড়াই যে কজন হাতেগোনা বিজ্ঞানী পৃথিবীর মানুষের চিন্তাভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল তাঁদেরই একজন! মাথাটাই যাঁদের গবেষণাগার, কলমই তাঁদের একমাত্র যন্ত্র। জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের পড়ার ঘরে শোভা পেত তাঁর ছবি।

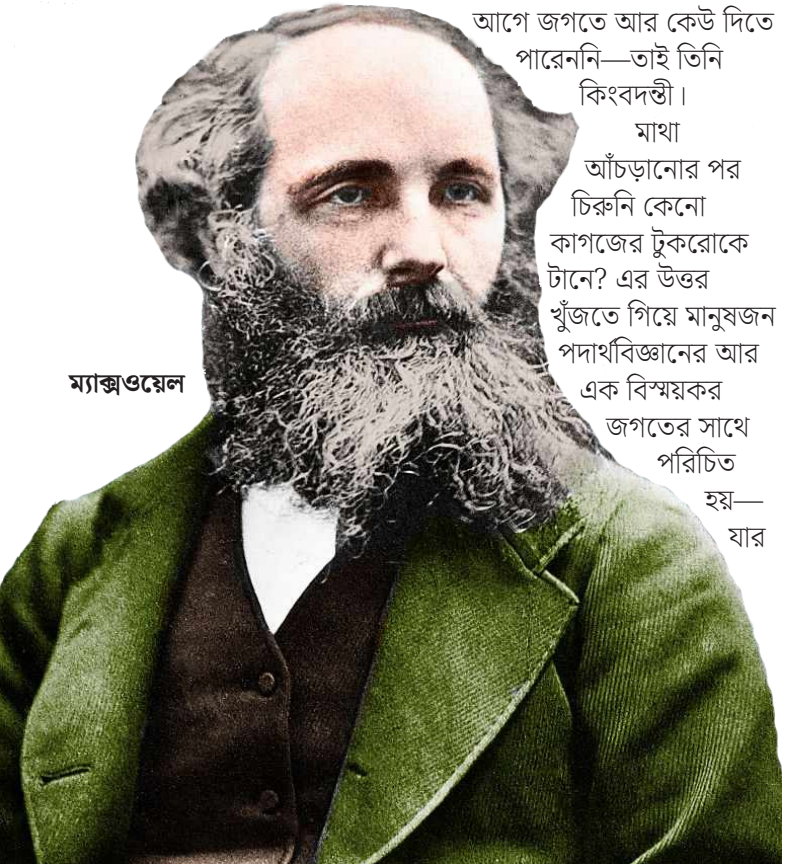
ম্যাক্সওয়েল

ছোটবেলা থেকে অঙ্কের প্রতি ঝোঁক ছিলো কিশোর ম্যাক্সওয়েলের। সেই সাথে জ্যামিতিক মাপযোগ সম্পর্কেও তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। মাত্র 14 বছর বয়সেই তিনি টুকরো টুকরো দড়ির সহযোগে জ্যামিতিক বক্র রেখা আঁকার এক যান্ত্রিক উপায় বার করেন। শুধু তাই নয়,ঐ বয়সেই উপবৃত্ত, কার্টেসিয়ান উপবৃত্ত এবং দুইটির বেশি নাভি বিন্দু বিশিষ্ট বদ্ধ বক্ররেখার চরিত্র নিয়েও পর্যালোচনা করেন তিনি। বয়সে ছোটো হওয়ায় তাঁর উপস্থাপিত জ্যামিতিক পদ্ধতি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস ফোর্বস রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠ করেছিলেন। মাত্র 18 বছর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ম্যাক্সওয়েল 1850 সালে কেমব্রিজে ভর্তি হন। কেমব্রিজ স্নাতক তরুণ ম্যাক্সওয়েল ট্রিনিটি কলেজে যোগদেন গবেষণার জন্যে। তাঁর কাজের বিষয় ছিলো আলোর মৌলিক তিনটি রং—লাল, সবুজ, নীল। জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন ও পদার্থবিদ ইয়ং এর মতো তিনি ও দৃশ্যমান আলোর বর্ণালী নিয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনিই প্রথম দেখান মৌলিক এই তিন রংয়ের সংমিশ্রণেই 'সাদা'র আবির্ভাব। এই বিষয়ক তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ 'এক্সপেরিমেন্টস অন কালার' এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি পাঠ করেন 1855 সালে। আজকের দুনিয়ায় চেনা গানের অনুষ্ঠান বা কোনো জাঁকজমক মঞ্চে, যে লাল, নীল, সবুজ আলোর ঝিকিমিকি আমরা দেখতে অভ্যস্ত এসবের নেপথ্যে ম্যাক্সওয়েলের এই বর্ণতত্ত্ব। আলোর রঙের ওপরে এইসব কাজের জন্যেই ম্যাক্সওয়েলকে রুমফোর্ড মেডেল দিয়ে সম্মানিত করে রয়্যাল সোসাইটি। আলোর রঙ বিষয়ক অধিকাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন লন্ডনে নিজের বাসভবনে—এবিষয়ে তাঁর একমাত্র সহকারি ছিলেন স্ত্রী ক্যাথরিন।

আলোর বর্ণতত্ত্ব ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে ম্যাক্সওয়েলের ছিল অবাধ বিচরণ। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সহ

বোল্টজম্যান

গ্যালভানি

ভোল্টা

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার লোকজনকে যে বিষয়টি জানতেই হয় সেটি হলো 'গ্যাসের গতীয়তত্ত্ব ও তাপগতিবিদ্যা'। গ্যাসের অনুগুলি খুবই দুরন্ত। সবসময় ছুটে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিকে। এদের বেগ যা খুশী হতে পারে। ম্যাক্সওয়েল এঁদের গতিবিধি বুঝতে প্রয়োগ করলেন সম্ভাবনা তত্ত্ব। প্রণয়ন করলেন বেগবণ্টন নীতি—বিজ্ঞানে সবাই যাকে চেনেন 'ম্যাক্সওয়েল ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন' নামে। বিভিন্ন উষ্ণতায় থাকা গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে কারা কতো জোরে ছুটছে তার একটা ধারণা মিলল সেখান থেকে। সেই সাথে কষে ফেলা গেলো অনুগুলির গড় বেগ, মূল গড়বর্গ বেগ, এমনকি কোন বেগ নিয়ে অধিকাংশ অনুগুলি ছুটছে অর্থাৎ সর্বাধিক সম্ভাবনা পূর্ণ বেগও অঙ্ক কষে বের করা গেলো সেখান থেকে। ম্যাক্সওয়েলের এই বণ্টন নীতি তাত্ত্বিকভাবে প্রথম প্রকাশ পায় 1860 সালে। শুরুর দিকে পরীক্ষামূলক কোনো প্রমান পাওয়া যায় নি। বোল্টজমান যদিও অনেক চেষ্টা করেছেন—বিশেষত গতিতত্ত্বে অণুর ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তৎকালীন সময়ের দুই প্রথিত যশা বিজ্ঞানী ম্যাক ও ওসওয়াল্ড ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যানের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাগিয়ে দেন। শুধু তাই নয় ওসওয়াল্ড আর এক কদম এগিয়ে ঘোষণা দেন পরীক্ষামূলক প্রমান ব্যতিরেকে শুধু অঙ্কের কচকচানি থেকে গ্যাসের অণু-পরামাণুর ধারণা বিজ্ঞানের জন্যে বিভ্রান্তিকর। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মহলের এতো সমালোচনা, টিপ্পনি বোল্টজম্যান নিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্যের সাপেক্ষে অনেক অঙ্ক, যুক্তি-প্রমান খাড়া করার চেষ্টা করেছেন আমৃত্যু। সেসব ধোপে টেকে নি তখন। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে 1906 সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পরিসংখ্যান পদার্থবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য কাজ করার জন্যে তিন বছর অন্তর অন্তর পুরুস্কৃত করা হয় 'বোল্টজম্যান মেডেল' দিয়ে। সারা দুনিয়া জুড়ে এই বিষয়ে যত লোক কাজ করেন—তাদের পুরোধা তিনি। যাক পরে কোনো এক সময় তাঁর কথা বলা যাবে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, ম্যাক্সওয়েলের তিরোধানের প্রায় অর্ধ শতাব্দি পরে অটো স্টার্ন প্রথমবার এই তত্ত্বের পরীক্ষমূলক প্রমান দেন।

ফিরে আসি তড়িৎচুম্বকত্বে ম্যাক্সওয়েলের কাজ নিয়ে। 1860 খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনের এক কলেজে যোগ দেন—যদিও কতৃপক্ষের বিভিন্ন অভিযোগের দরুণ যা বছর পাঁচেকও স্থায়ী হয় নি। সেই সময় তার বাবা মারা যাওয়ায় তিনি আরো দিশেহারা হয়ে পড়েন। সব ছেড়ে ছুড়ে জন্মভূমি স্কটল্যান্ডে ফিরে যান। চাকরিচ্যুত ম্যাক্সওয়েল গভীরভাবে তড়িৎচুম্বকত্বে মনোনিবেশ করেন এই সময়ে। দেশ বিদেশের রথী মহারথীরা তড়িৎচুম্বকত্বের ওপর কি কাজ করেছেন—সেগুলো জুড়তে থাকেন একে একে। শুধু জুড়লেই তো হবে না, মাঝে কি ফাঁক ফোকর আছে সেগুলো ও খুঁজে, বুঝে ভরাট করতে হবে—সে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ। আর্থিক ভাবে বেকার একজন যুবক এই বিরাট বিজ্ঞানসাধনায় ঝাঁপ দিলেন, সম্বল কেবলমাত্র চিন্তা করার মতো একটা মাথা।

ম্যাক্সওয়েলের কাজ বুঝতে গেলে আমাদের একটু ফিরে তাকাতে হবে অষ্টাদশ শতকে স্থিরতড়িৎ ও চুম্বকত্ব বিষয়ক কি কি কাজ হয়েছিল তার ওপর। পদার্থবিদ গ্যালভানি ও ভোল্টা প্রথম পরিবাহীর ভিতরে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তৎকালীন সময়ের এক স্কুল শিক্ষক দেখান সূচী চুম্বকের কাছে তড়িৎবাহী তার নিয়ে গেলে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপন হয়। সেই বিক্ষেপনের নিয়ম আজও স্কুলের পাঠ্য—ওরস্টেডের নিয়ম শিরোনামে। এরপর আর এক বিজ্ঞানী অ্যাম্পিয়ার দেখালেন দুটি ধাতব তারের ভিতরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পাঠালে তারা একে অপরের ওপর বল প্রয়োগ করে। চুম্বকত্ব বিষয়ে, বিশেষত তড়িৎচুম্বকত্বের গবেষণায় অ্যাম্পিয়ারের তখন বিরাট নামডাক। ম্যাক্সওয়েল তার নাম দিয়েছিলেন 'তড়িৎ বিদ্যার নিউটন'। এরপর আর এক প্রতিভাধর, ফ্যারাডে দেখান সময়ের সাথে চুম্বক বলরেখার পরিবর্তন ঘটালে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের উদ্ভব হয়। এদিকে দুটি আধানের মাঝে ক্রিয়াশীল বলের গণনা কুলম্ব ততদিনে করে ফেলেছেন। তড়িৎক্ষেত্র ও চুম্বকক্ষেত্রের মাঝে কোথাও যে একটা যোগসূত্র আছে—সেটা এতদিনে ম্যাক্সওয়েল ঠাওর করতে পেরেছিলেন। এখন বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় সেই যোগসূত্র?

অ্যাম্পিয়ার

ম্যাক্সওয়েল তাঁর সমীকরণগুলি প্রকাশ করেন সমাকলন ও অবকলন বিদ্যার সহযোগে। অঙ্ক ব্যাতিরেকে আমরা দেখার চেষ্টা করি কি আছে সেই সমীকরণগুলিতে?

প্রথম সমীকরণঃ দুটি আধানের মধ্যে কার্যকরী বল আধানদুটির গুণফলের সমানুপাতিক, সাথে

তাদের ভিতরকার দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই বল কুলম্বিয় বল নামে পরিচিত। তড়িৎ বলরেখার সাহায্যে আমরা এই বলকে প্রকাশ করতে পারি। তড়িৎ-বলরেখাগুলি ধনাত্মক আধান থেকে বের হয় ও ঋণাত্মক আধানে এসে মিলিত হয়। এই বিবৃতিকেই কলনবিদ্যায় প্রকাশ করলে ম্যাক্সওয়েলের প্রথম সমীকরণে রুপান্তরিত হবে। তাঁর আগে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গাউস স্থির তড়িতের ক্ষেত্রে এই সুত্র প্রকাশ করেন—যা গাউসের সুত্র নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় সমীকরণঃ আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি একটা ছোট দণ্ডচুম্বককে আনেক টুকরো করলে, প্রতিটি টুকরোই এক একটা চুম্বক। প্রত্যেকেরই উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরু বিদ্যমান। শুধু উত্তর মেরু বা শুধু দক্ষিণ মেরু কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। ফলত তড়িৎ বলরেখার মতো চুম্বক বলরেখাগুলি মুক্ত নয়, বদ্ধ। এই ব্যাপারটার আঙ্কিক রুপই হল ম্যাক্সওয়েলের দ্বিতীয় সমীকরণ।

তৃতীয় সমীকরণঃ ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ বিষয়ক সুত্রগুলি থেকে জানা যায় সময়ের সাথে পরিবর্তিত চুম্বক বলরেখাগুলি আবিষ্ট তড়িৎক্ষেত্রের জন্ম দেয়। এরই কলনবিদ্যার পরিবর্তিত রুপই ম্যাক্সওয়েলের তৃতীয় সমীকরণ।

চতুর্থ সমীকরণঃ আধান গতিশীল হলে তড়িৎ-প্রবাহের জন্ম দেয়, যা চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। অ্যাম্পিয়ারের এই কালজয়ী সুত্রকে কলনবিদ্যায় রুপ দিতে গিয়ে ম্যাক্সওয়েল দেখলেন অ্যাম্পিয়ারের সুত্র স্টেডি কারেন্ট-এর বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহের বেলায় হিসাব তো মিলছে না? হিসেব মেলানোর জন্য ম্যাক্সওয়েল প্রস্তাব দিলেন এক বিশেষ কারেন্ট এর। যার পোশাকি নাম 'ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট', যেটা কিনা শূন্যস্থানের ভিতর দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে। আমাদের পরিচিত কারেন্ট এর মতো এই বিশেষ কারেন্ট যাওয়ার জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এটাই **'ম্যাক্সওয়েল সংশোধন'**। ম্যাক্সওয়েল হাত দেওয়ার পরে অ্যাম্পিয়ারের সুত্রের পরিবর্তিত এই রুপ যেকোনো তড়িৎ প্রবাহের বেলায় প্রযোজ্য।

এই সমীকরণগুলির ওপর ভিত্তি করে ম্যাক্সওয়েল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ধারণা দেন। তিনি দেখান এই তরঙ্গ আলোর বেগ নিয়ে চলে। তাঁর এই কাজের ওপর দাড়িয়ে আছে ইলেকট্রনিক ও টেলি যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখাটি। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন আধান ত্বরান্বিত হলেই তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত হবে। তাঁর জীবদ্দশায় যদিও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের পরীক্ষামূলক প্রমান মেলেনি। 1887 খ্রিঃ, তাঁর মৃত্যুর প্রায় 8 বছর পর হার্টজ এই তরঙ্গের পরীক্ষামূলক প্রমান দেন—যার কয়েক দশক পরে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস ও ইতালীয় বিজ্ঞানী মারকনি রেডিও-তরঙ্গ তৈরী করলে বিশ্বে প্রথম তারবিহীন যোগাযোগ ব্যাবস্থা শুরু হয়েছিল। সেই টেলি-যোগাযোগ ব্যাবস্থার ক্রমশ বিকাশ ও উন্নতি আজ এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে এক-মিনিটও তারহীন যোগাযোগ ছাড়া আধুনিক বিশ্ব পুরোপুরি অচল।

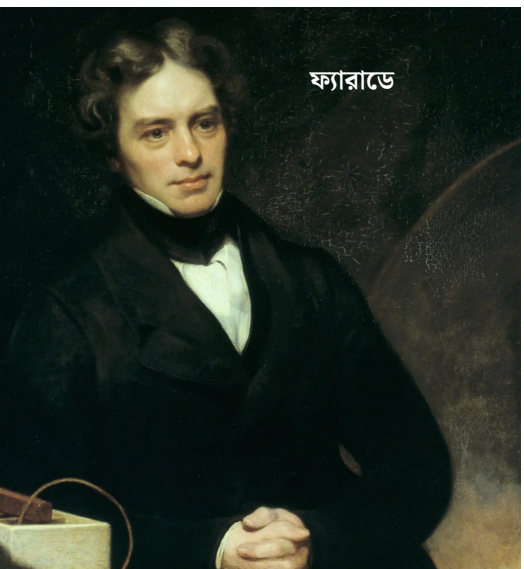
ফ্যারাডে

হার্টজ

সারাবিশ্বে হাইস্কুলের ছাত্রদের বলবিদ্যার পাঠক্রমে একটা অধ্যায় আছে সাম্যের ওপর। সুস্থির সাম্য, অস্থির সাম্য, ইত্যাদি। আসলে একটা বস্তুর বিভিন্ন দিক থেকে আসা বলের হিসাব করা হয় এখানে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এয়ারি 'এই সাম্য' গুলি বোঝার জন্য অঙ্কের প্রয়োগ করেছিলেন। সেই সময়ে একটা প্রশ্ন বিজ্ঞানী মহলে ঘুরপাক খাচ্ছিল—শনির বলয়গুলি কি দিয়ে তৈরি? কঠিন না তরল? সাম্য নিয়ে অঙ্ক কষে ম্যাক্সওয়েল দেখালেন শনির বলয় কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি হতেই পারে না। কারণ কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি হলে তাদের গতি কোনদিন সুস্থির হতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হলে বলয়গুলির আর অস্তিত্ব থাকতো না। অথচ সেগুলি যুগের পর যুগ একই রকমই আছে। অতএব তারা যে গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে—'গুনে নুন দেওয়ার জায়গা নেই'। বিজ্ঞানে ম্যাক্সওয়েল সেরকমই এক রতন—যার মেধার ছোঁয়ায় বিজ্ঞান যে কত যোজন এগিয়ে গেছে তার কোন হিসেব নেই। প্রতিভার খনি হওয়া সত্তেও ম্যাক্সওয়েল ছিলেন খুব লাজুক ও বিনয়ী—কেউ প্রশংসা করলে গুটিয়ে যেতেন। কিন্তু এই মহান বিজ্ঞানী পঞ্চাশ পেরোনোর আগেই কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে 1879 সালে মারা যান। অকালেই থেমে যায় ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার ম্যাক্সওয়েল নামক বিজয় রথ।

*লেখক **শ্রী শামীম হক মণ্ডল** রাজ্য বিচার সহায়ক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত এবং একজন বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: shamimmondal709@gmail.com*

মোহনচূড়া

তাপস কুমার দত্ত

পাখির ছবি তুলতে গিয়ে দুপুরবেলা মাঠের জমির মধ্যে দেখা পেতাম এক বিশেষ ধরনের পাখি যারা কিনা মাথা নীচু করে সারাক্ষণই জমির মধ্য থেকে খুঁজে বেড়ায় খাবার, আবার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে সামান্য উড়ে গিয়ে অন্য জায়গাতে যেত, তখন সে তার মাথার ঝুঁটিটি সুন্দর করে মেলে ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা নামিয়ে নিত। এই ব্যাপারটা বেশ ভালই উপভোগ করতাম। এদের ছবি তুলতে গিয়ে অনেক সময় ব্যায় করলেও কখনও নিরাশ হয়নি, প্রাণভরে এই পাখির ছবি তুলেছি। এতো কিছু বলতে গিয়ে আসল পাখির নামটাই বলতে ভুলে গেছি। আমি যে পাখির কথা এখন বলছি তাহলো আমাদের অতি প্রিয় একটি পাখি মোহনচূড়া। সত্যিই কথা বলতে কি তার মাথার ঝুঁটি মোহনচূড়ার মতনই। শুনেছি এই পাখির বাংলাতে নামকরনের জন্য একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম জড়িয়ে আছে। প্রথম যখন শুনি তখন খুব অবাক হয়েছিলাম। একজন মানুষ কতটা প্রকৃতি প্রেমিক হলে একটা পাখির নাম দিতে পারেন, তার ভাবনার প্রশংসা না করে পারা যাবেনা। তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ ও প্রিয় সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল।

ইংরাজীতে এই পাখিকে আমরা Common Hoopee বলে থাকি। এছাড়া এই পাখিকে আরো অনেক নাম আছে, অনেকে এই পাখিকে হুদহুদ, কাঠকুড়ালিও বলে থাকেন। এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো Upupa epops. এই পাখি আমাদের হালিসহর উত্তর ২৪ পরগনার স্টেশন সংলগ্ন মাঠে প্রচুর সংখ্যাতে দেখা মেলে। একটাই আশার আলো এই যে আমাদের পরিবেশ থেকে এই মুহূর্তে এই পাখির হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই। এই পাখি দেখতে বড়ই সুন্দর এবং এর ঝুঁটির সৌন্দর্য্য সব থেকে বেশী। এই পাখির ঝুঁটি সবাইকেই আকৃষ্ট করে।

মোহনচূঁড়া পাখি আকারে লম্বাতে 25 – 32 সেমি হয়ে থাকে। এদের দেহের রঙ বাদামী এবং লেজে সাদা ও কালো দাগ থাকে। এদের ঠোঁট আকার কিছুটা বাঁকা, লম্বা ও কালো হয়ে থাকে। মাথার উপর আছে সুন্দর একটি ঝুঁটি। এই ঝুঁটি সব সময়ে দেখা যায়না, পাখি উত্তেজিত হলে তার সুন্দর ঝুঁটিকে মেলে ধরে। এই ঝুঁটির বাদামী পালকের মাথাটি কালো রঙের হয়ে থাকে।

এই পাখিকে মেঠো পাখি বলা যেতে পারে কারন এরা মাঠের মধ্যেই সব সময়ে চড়ে বেড়াতে ভালোবাসে। তাছাড়া গ্রামের ঘরবাড়ির আঙিনাতেও এদের চড়ে বেড়াতে দেখা যায়। গাছের কোঠরের মধ্যেই এরা বাসা করতে বেশী ভালোবাসে, এছাড়া বাড়ির পুরানো দেওয়ালের ফাঁক ফোঁকরের মধ্যেও এদেরকে অনেক সময়ে বাসা করতে দেখা যায়।

আমরা যদি এই পাখির খাদ্য তালিকা দেখি তবে দেখতে পারবো এদের খাদ্য তালিকাতে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ ও ফল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। এছাড়া মাঠের মাটির মধ্যে এরা লম্বা ঠোঁটকে ঢুকিয়ে সেখান থেকে পোকামাকড় সংগ্রহ করে খাদ্যের জন্য। এছাড়া এরা অভিনব উপায়ে উইপোকাকে শিকার করে এটা দেখলে খুবই অবাক হতে হয়। এরা উঁইপোকার গর্তে লম্বা ঠোঁটকে যখন ঢুকিয়ে দেয় তখন উঁইপোকারা ঠোঁট বেয়ে গর্ত থেকে উঠে মাটির উপর উঠে আসলে এরা সেই উঁইপোকাকে ঠুকরে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইভাবে বার বার উঁইপোকা যেখানে আছে সেখানে এরা ঠোকরাতে থাকে।

বছরের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে এদের প্রজনন হয়ে থাকে। এই প্রজনন কালে এরা তাদের বানানো বাসাতে 4 – 5 টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি আকারে গোলাকার ও সাদা রঙের হয়ে থাকে। বাসাতে স্ত্রী পাখি তা দিয়ে 18 – 20 দিনর মাথায় সদ্যজাত বাচ্ছার জন্ম দেয়। এই সদ্যজাত বাচ্ছাদের গায়ের রঙ হালকা বাদামী ও তাতে হালকা পালক থাকে।

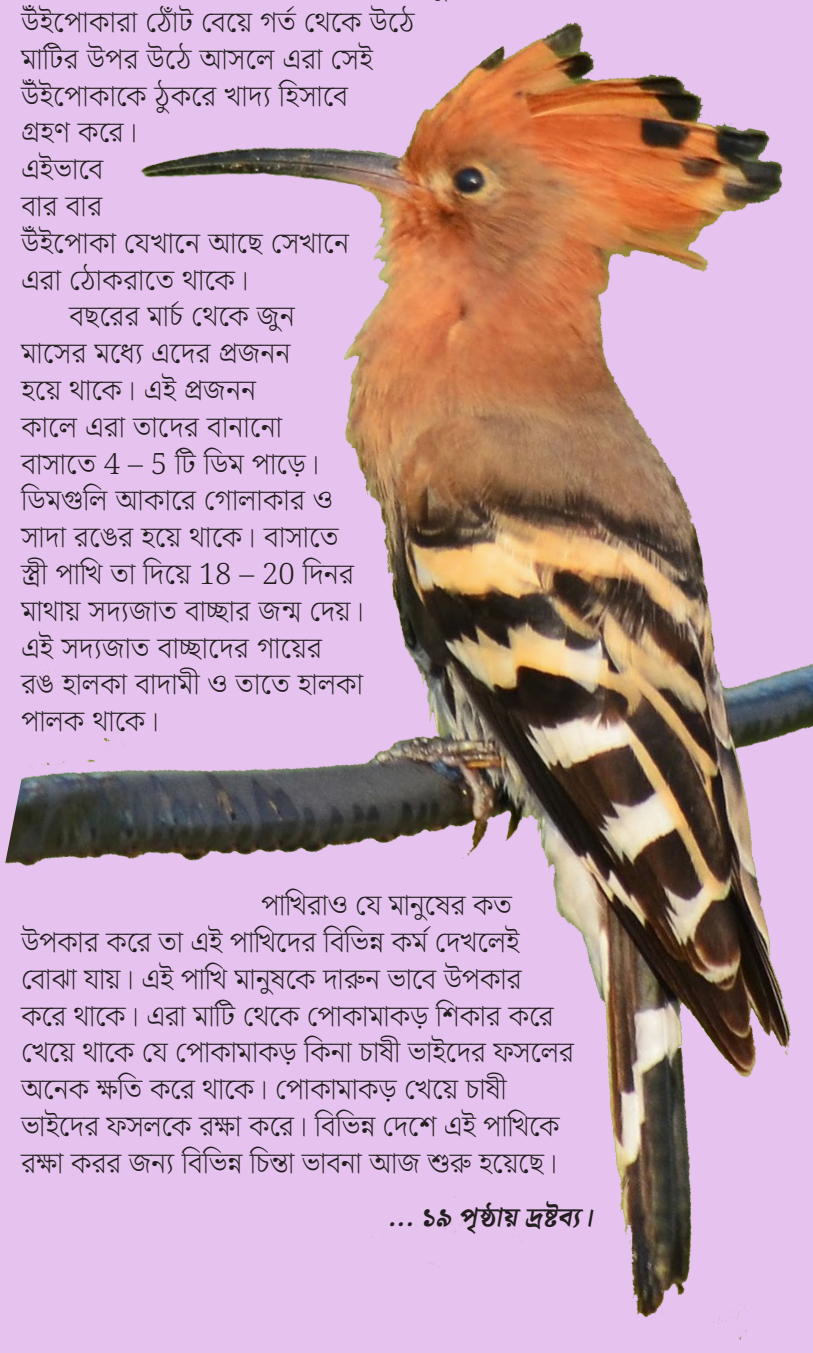

পাখিরাও যে মানুষের কত উপকার করে তা এই পাখিদের বিভিন্ন কর্ম দেখলেই বোঝা যায়। এই পাখি মানুষকে দারুন ভাবে উপকার করে থাকে। এরা মাটি থেকে পোকামাকড় শিকার করে খেয়ে থাকে যে পোকামাকড় কিনা চাষী ভাইদের ফসলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। পোকামাকড় খেয়ে চাষী ভাইদের ফসলকে রক্ষা করে। বিভিন্ন দেশে এই পাখিকে রক্ষা করর জন্য বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আজ শুরু হয়েছে।

... ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যারা আলো জ্বেলেছিল (পর্ব – ৯)

অরুণাভ দত্ত

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অগ্রগতি সমানুপাতিক। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ততই বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতার স্বরূপ। শুরুটা হয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াই দিয়ে। সে লড়াই আজও থামেনি। চলছে পৃথিবীর অবর্তমানে অন্য গ্রহে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ থেকে অ্যাপোলো 11, দ্রুততার সঙ্গে মানুষ পৌঁছেছে উন্নতির শিখরে এবং বিজ্ঞানের এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁদের জন্যই যাঁরা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে প্রথম বিজ্ঞানের আলো জ্বেলেছিল।

আর্যভট্ট আর কোপারনিকাস। একজন অন্যজনের চেয়ে বয়সে প্রায় হাজার বছরের বড়। দুজনের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি সবই আলাদা; কিন্তু তাঁরা উভয়েই সেই পৃথিবীরই বাসিন্দা, যে পৃথিবী অ্যারিস্টটল, টলেমির মতামতের তোয়াক্কা না করে আবহমান কাল ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আর্যভট্ট আর কোপারনিকাসই প্রথম বলেছিলেন সে কথা। একজন প্রাচ্যে, অন্যজন পাশ্চাত্যে। তাঁদের দুজনের মধ্যে আরও মিল হল যে, প্রথম প্রথম তাঁদের দুজনের মতবাদকেই গ্রাহ্য করা হয়নি। কোপারনিকাসের কথা আমরা অল্প-বিস্তর জানি, কিন্তু আর্যভট্ট? ইতিহাস বলছে যে, আর্যভট্ট প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতি তাঁর পরবর্তী হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

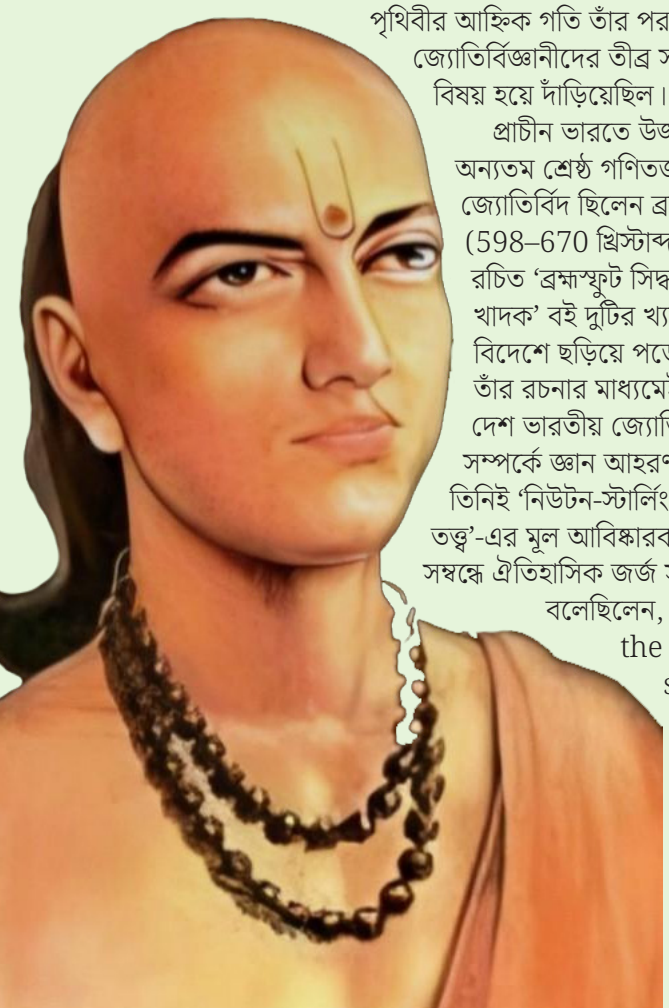

আর্যভট্ট

প্রাচীন ভারতে উজ্জয়িনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত (598–670 খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রচিত ‘ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত’ ও ‘খন্ড খাদক’ বই দুটির খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আরব দেশ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিল। তিনিই ‘নিউটন-স্টার্লিং সন্নিবেশ তত্ত্ব’-এর মূল আবিষ্কারক। তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন বলেছিলেন, ‘One of the greatest scientists of his race and the greatest of his time’। সেই ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভট্টের ব্যাখ্যা করা পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে বিশ্বাস করতেন না। এমনকী চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি বৈদিক হিন্দুদের রাহু-কেতু মতবাদের উপর আস্থা রাখতেন। আর্যভট্ট অশাস্ত্রীয় মতবাদ শিক্ষা দিচ্ছেন ভেবে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর তীব্র নিন্দা করেন। উজ্জয়িনীর আরও এক রত্ন ছিলেন বরাহমিহির। তাঁকে প্রাচীন ভারতের প্লিনি বলা হয়। সেই বরাহমিহিরও মানতেন না যে, পৃথিবী ঘুরছে। তিনি আর্যভট্টের

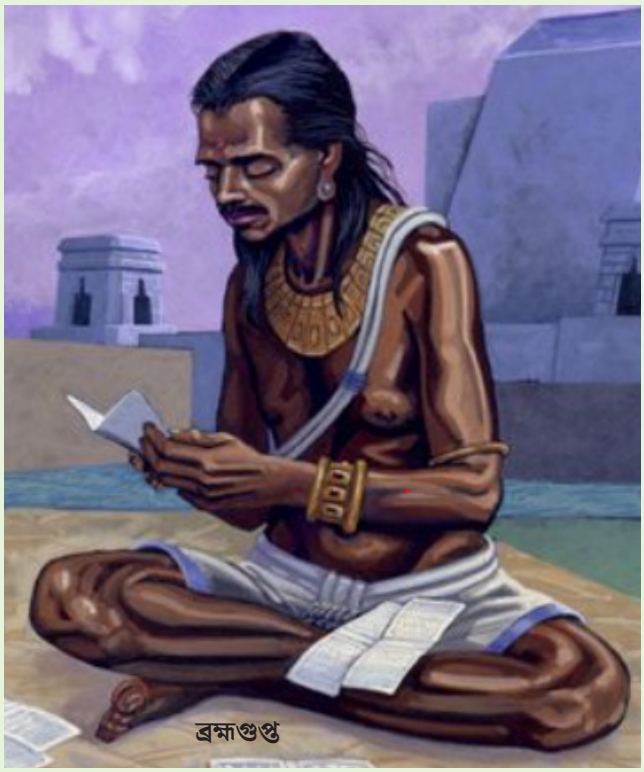

ব্রহ্মগুপ্ত

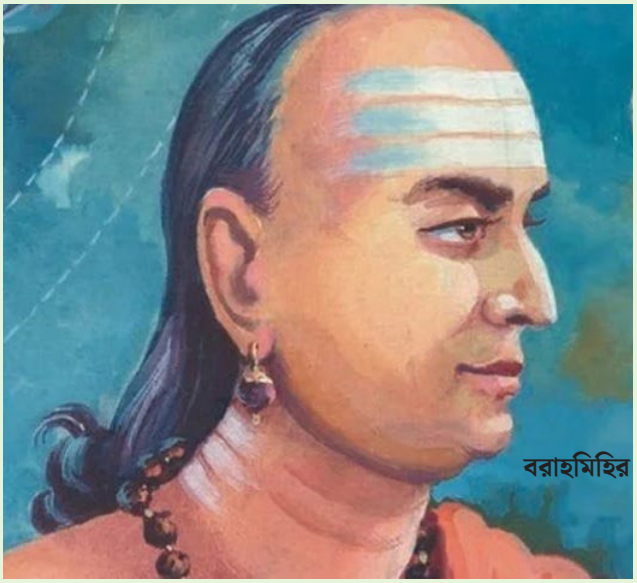

বরাহমিহির

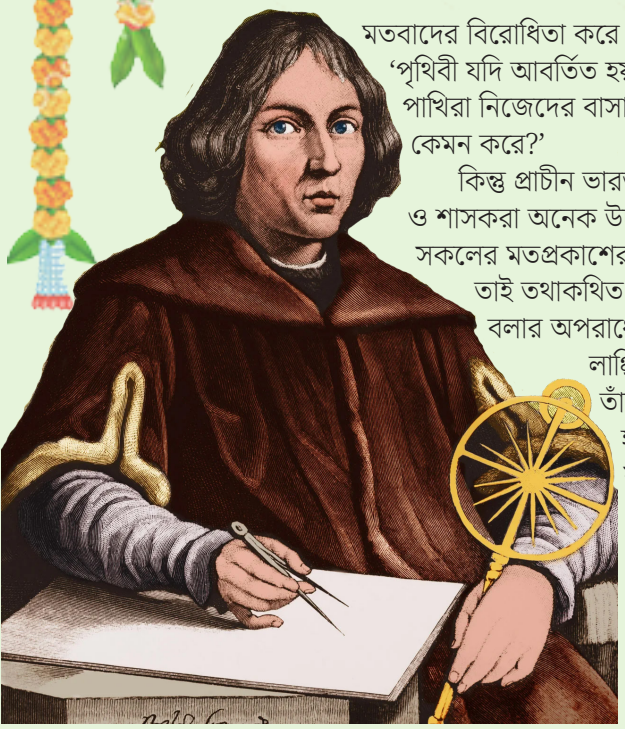

কোপারনিকাস

মতবাদের বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ‘পৃথিবী যদি আবর্তিত হয় তা হলে পাখিরা নিজেদের বাসায় ফিরে আসে কেমন করে?’

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের পণ্ডিত ও শাসকরা অনেক উদার ছিলেন। সকলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। তাই তথাকথিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলার অপরাধে আর্যভট্টকে লাঞ্ছিত হতে হয়নি, তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়নি মৃত্যুদণ্ডের ফরমান। শাসক কিংবা পুরোহিততন্ত্রের চাপে জনসমক্ষে নতজানু হয়ে ফিরিয়ে নিতে হয়নি নিজের মতবাদ। কিন্তু কোপারনিকাসের সে সৌভাগ্য ছিল না। কোপারনিকাস যখন মৃত্যুশয্যায় তখন ছাপা হয়েছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের আলোকবর্তিকাস্বরূপ ‘দি রিভুলিউশন’ বইটি। পরে জানা গিয়েছে যে, বইটি মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেকটাই আলাদা। এমনকী বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপিটি গায়েব হয়ে যায়। সেটা পাওয়া গিয়েছিল প্রায় 250 বছর পরে। কোপারনিকাসের সমাধিও অনেক পরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। 1543 সালের 24 মে কোপারনিকাস প্রয়াত হন। তাঁর ‘দি রিভুলিউশন’ প্রকাশিত হওয়ায় পরে পরেই কিন্তু সমালোচনার ঝড় ওঠেনি। তার একটা কারণ হতে পারে যে, তখন সদ্য কোপারনিকাস প্রয়াত হয়েছিলেন। আবার অনেকের মতে, চার্চ বইটির গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারেনি। বইটির ভাষাও ছিল জটিল। তাই চার্চের চোখে ধুলো দিয়ে কোপারনিকাসের বই বহু দিন ধরে বহু লোকের হাতে হাতে ঘুরেছে।

ক্রমে ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে গেল বাইবেল বিরোধী চিন্তা। শোনা যায়, ‘দি রিভুলিউশন’ নিয়ে প্রথম আপত্তি তোলেন ক্যাথলিক চার্চের মুখ্য সেন্সর বার্তোলোমিও স্পিনা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু জিওভান্নি ‘অন দি ট্রুথ অফ স্যাকরেড স্ক্রিপচার’ বইটি লিখে কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী যে চলছে তার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। কোপারনিকাস মনগড়া কথা বলেছেন। জিওভান্নির মতে, ‘প্রাকৃতিক বস্তুর ধর্ম খুঁজতে গণিত কোনও কাজে লাগে না। কোপারনিকাস অ্যারিস্টটল, টলেমির লেখা পড়েননি কিংবা পড়েছেন, কিন্তু বোঝেননি।’ গির্জা কোপারনিকাসকে বাইবেল অবমাননার অপরাধে কঠিন শাস্তি দিত, কিন্তু তিনি তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কোপারনিকাসের প্রাপ্য শাস্তি জুটল আরও এক সত্যান্বেষীর কপালে।

ইতালীয় জ্যোতির্বিদ ও অধ্যাপক জিওর্দানো ব্রুনো। কোপারনিকাসের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ব্রুনো 1548 খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সৈনিক। বাপ-মা হারানো অনাথ ছেলে ব্রুনো ক্যাথলিক চার্চে মানুষ হয়েছেন। 1572 সালে ব্রুনো চার্চের সংগঠনে প্রবেশ করেন এবং ধর্মযাজকের পদ লাভ করেন। চিরকালই ব্রুনো গতানুগতিক চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে ভাবতে ভালবাসতেন। ব্রুনো ছিলেন অসম্ভব জেদি। যা ভাল মনে করতেন তা নির্ভয়ে প্রচার করতে পিছপা হতেন না। কিন্তু তার ফল হত মারাত্মক। খ্রিস্টধর্মে ‘আরিয়ানিজম’ নামে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। ব্রুনো আরিয়ানিজম সম্পর্কে চিরাচরিত চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে নিজের মতামত খোলাখুলি প্রচার করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, ব্রুনো একজন ধর্মযাজক হয়েও খ্রিস্টের দেবত্বকে অস্বীকার করছেন। চার্চের ছত্রছায়ায় বড় হয়েও চার্চের গোঁড়ামি কখনই ব্রুনোর মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারেনি।

একদিন তরুণ ব্রুনো চার্চের লাইব্রেরি থেকে খুঁজে পেলেন চামড়ায় বাঁধানো, ধুলো ভর্তি, ইঁদুরে কাটা একটি বই। লাতিন ভাষায় লেখা ‘দি রিভুলিউশন’। বইটির কথা এর আগে শুনেছিলেন ব্রুনো। এখন হাতে পেয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। যত পড়েন, ততই অবাক হন। যে চার্চের ছত্রছায়ায় বড় হয়েছেন, সেই চার্চের মতবাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বুঝতে পারেন

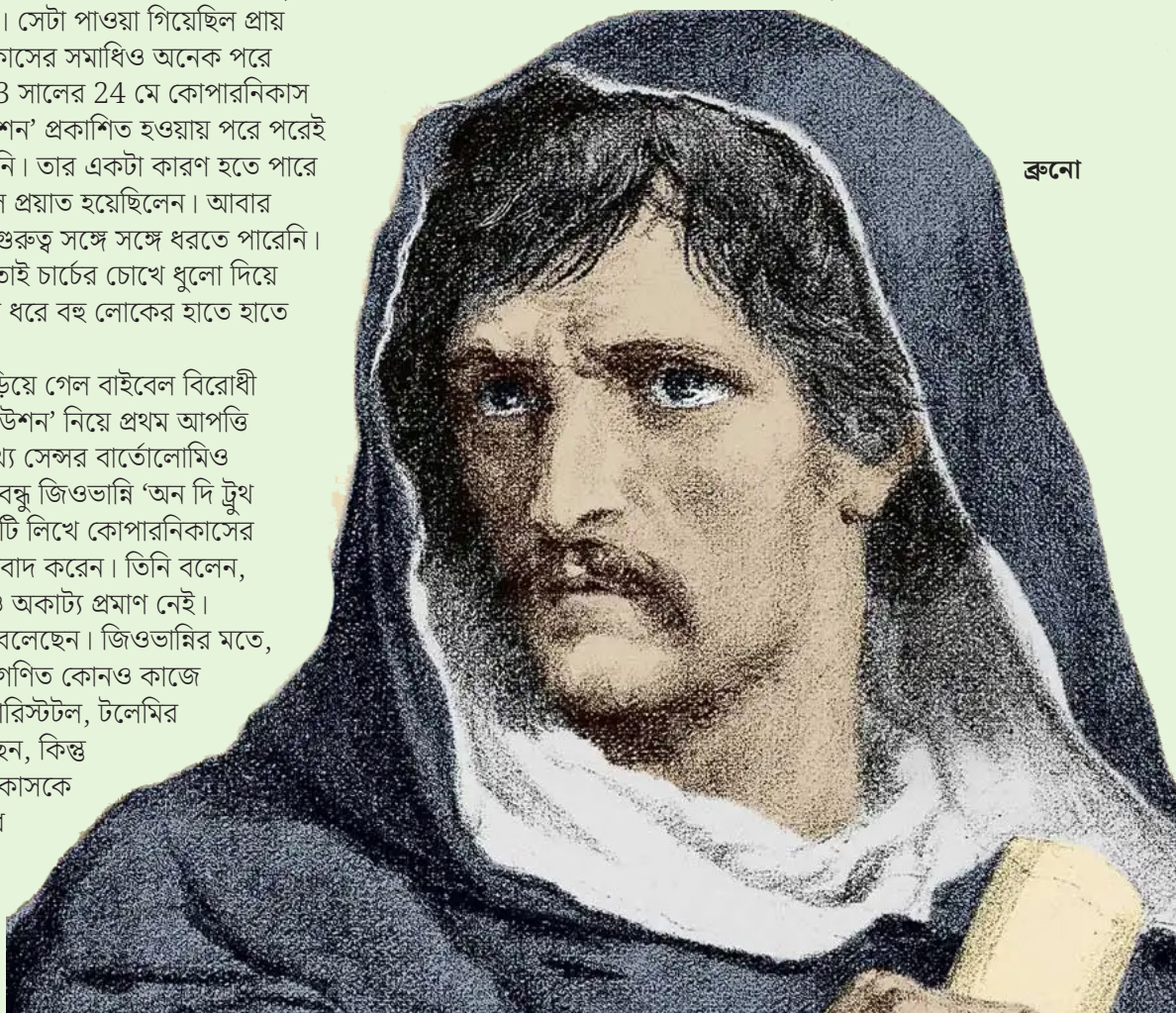

ব্রুনো

কোপারনিকাসের প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। শোনা যায়, খ্রিস্টীয় মঠের শৌচালয়ে তিনি বইগুলো লুকিয়ে রাখতেন। রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সেগুলো বের করে পড়তেন। একদিন ব্রুনো ধরা পড়ে গেলেন। চার্চ তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বিচারসভা ডাকল। 1576 সালে ব্রুনো চার্চের সংগঠন ত্যাগ করেন এবং রোমে পালিয়ে যান।

কূপমণ্ডুক হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও সার্থকতা খুঁজে পাননি ব্রুনো। তিনি যা জেনেছেন, তা শুধু নিজের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর লক্ষ ছিল চার্চের অযৌক্তিক ধারণাগুলোকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলা। তাই দেখা যায়, সেই শত্রুপরিবেষ্টিত অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞানের আলো হাতে নির্ভীক ব্রুনো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোপারনিকাসের মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এমনকী কোপারনিকাসকেও ছাপিয়ে গেলেন ব্রুনো। নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করলেন দূরের নক্ষত্রগুলোর প্রতি। বললেন, ‘প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য। আর তাদের প্রদক্ষিণ করে চলেছে একাধিক গ্রহ। শুধু পৃথিবী কেন সূর্যও নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘোরে।’ চার্চের ‘অবিনশ্বর বিশ্বজগত’ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে ব্রুনো বলেছেন, ‘বিশ্বজগতে সমস্ত বস্তুরই জন্ম ও মৃত্যু আছে।’

চার্চের ‘অবিনশ্বর বিশ্বজগত’ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে ব্রুনো বলেছেন, ‘বিশ্বজগতে সমস্ত বস্তুরই জন্ম ও মৃত্যু আছে।’

ব্রুনো মনে করতেন তিনি যে ঈশ্বরকে মানেন, তিনি অনন্ত। তাই ঈশ্বর নিজে যদি অনন্ত হন, তবে তাঁর সৃষ্টি করা ব্রহ্মাণ্ডটাও নিশ্চয় অসীম হবে। জনৈক রোমান দার্শনিকের লেখা ‘On the nature of things’ বইটি পড়ে ব্রুনোর মনে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা আরও পোক্ত হয়ে ওঠে। ব্রুনোর মৃত্যুর অনেক দশক পরে তাঁর সমস্ত কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, পৃথিবী যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তেমনি সূর্যও সৌরপরিবার সমেত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অবিরাম ভাবে ঘুরে চলেছে। আবার মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও প্রবল বেগে এই ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরছে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ছাড়াও মহাকাশে আছে প্রচুর গ্যালাক্সি। সেই সমস্ত গ্যালাক্সিতে রয়েছে আমাদের সৌরপরিবারের মতোই গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র। মহাকাশে কত নক্ষত্র ধ্বংস হচ্ছে, আবার জন্মাচ্ছে। আমাদের এই সূর্যও একদিন ধ্বংস হবে। থাকবে না বুধ, শুক্র, পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো। আবার 1929 সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল প্রমাণ করেছেন যে, মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলো ক্রমশ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে। মহাবিশ্বের কোনও সীমা নেই। ব্রুনো টেলিস্কোপহীন যুগে বসে খালি চোখে আকাশ দেখে এত কথা কীভাবে যে বলতে পেরেছিলেন, তা আজও পরম বিস্ময়ের!

1576 থেকে 1592, এই সুদীর্ঘ বছর ব্রুনো ভবঘুরে জীবন কাটিয়েছেন। দেশে দেশে গিয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করেছেন। তারপর গোঁড়া খ্রিস্টানদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কথা রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং প্রটেস্টান্ট চার্চ উভয়েই অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু ব্রুনো অপ্রতিরোধ্য। শোনা যায়, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোথাও কোনও কাজ পেতেন না। সকলেই তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল। 1581 সালে যখন তিনি ফ্রান্সে যান, তখন সেখানকার রাজা আকৃষ্ট হন ব্রুনোর অসামান্য প্রতিভার প্রতি। তাই প্যারিসে রাজার অনুগ্রহে ব্রুনো নিশ্চিন্তে কাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই ‘On the infinite universe and worlds’। 1583 সালে তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে লন্ডনে আসেন। সঙ্গে ছিল রাজার দেওয়া একটি পরিচয়পত্র। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে যখন তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল, তখন ব্রুনো ভেবেছিলেন যে, এবার হয়তো তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঠিক মূল্যায়ন হবে। কিন্তু অক্সফোর্ডে বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে ব্রুনো যখন বলতে শুরু করলেন, ‘পৃথিবী ঘুরছে ... সূর্য ঘুরছে ... ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত’, তখন দেখা গেল আলোচনাসভা মুহূর্তে কলহ-বিবাদে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সবাই রাগে ফুঁসছে।

1585 সালে ব্রুনো আবার ফিরে এলেন ফ্রান্সে। তখন ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে ব্রুনো মুখ খুলে বিপদে পড়লেন। তিনি জার্মানি পালালেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর উপর চড়াও হল লুথেরিয়ান চার্চ। 1591 সাল। ইতালির ভেনিস থেকে জিওভান্নি মচেনিগো নামক এক তরুণ ব্রুনোকে চিঠি লিখে জানাল যে, সে

ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড

ব্রুনোর ছাত্র হতে চায়। সুদীর্ঘকাল পর জন্মভূমির ডাক পেয়ে ব্রুনো আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন। মচেনিগোর ফাঁদে পা দিয়ে চলে এলেন ভেনিসে। বিশ্বাসঘাতক মচেনিগো ব্রুনোকে তুলে দিল প্রহরীদের হাতে। গির্জা তাঁর বিরুদ্ধে 130টি অভিযোগ এনেছিল। 1592 সালে ব্রুনো কারাগারে বন্দি হলেন। বিচারের নামে প্রহসন হল। জেলবন্দি ব্রুনোকে গির্জা অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল যে, ব্রুনো নিজের ভুল স্বীকার করলেই মুক্তি পাবে। শোনা যায়, গ্যালিলিও গির্জার চাপে পড়ে দু'বার নিজের মতামত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রুনো মাথানত করেননি। ব্রুনোকে পাদরিরা এত ভয় পাচ্ছিল কেন? কারণ ব্রুনো প্রচার করতেন, 'একমাত্র নৈতিক শিক্ষার জন্য বাইবেলকে অনুসরণ করা উচিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার জন্য নয়। কারণ বাইবেলে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে যা বলা আছে তার সিংহভাগই ভুল।' ব্রুনোর এই মন্তব্য সত্য প্রমাণিত হলে প্রশ্ন উঠত যে, গির্জা কি এতকাল জেনেশুনে জনগণের মধ্যে ভুল ধারণা প্রচার করেছে? ঈশ্বরের নিয়মের দোহাই দিয়ে পাদরিরা কি তলে তলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে?

আট বছর জেলবন্দি থাকার পর 1600 সালে গির্জা তাঁকে শেষ সুযোগ দিল, ব্রুনো নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেই মুক্তি পাবে। ব্রুনো আবারও তা অস্বীকার করলেন। ইনকুইজিশন আদালত ব্রুনোর প্রাণদন্ডের আদেশ দিল। মধ্যযুগে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মীয় বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে গির্জা বিশেষ আদালত গঠন করে। সেই বিশেষ আদালতের নাম ইনকুইজিশন। বিধর্মী ব্রুনোর শাস্তি ছিল বিনা রক্তপাতে মৃত্যু অর্থাৎ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা! নির্দিষ্ট দিনে ব্রুনোকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে। খুঁটিতে বাঁধার আগে অপরাধ স্বীকার করার শেষ সুযোগ দেওয়া হলে ব্রুনো ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। চার্চের ভয় ছিল মৃত্যুর আগে ব্রুনো নিশ্চয় জনগণকে সত্য জানানোর শেষ চেষ্টা করবেন। সুতরাং তাঁর জিভ কেটে

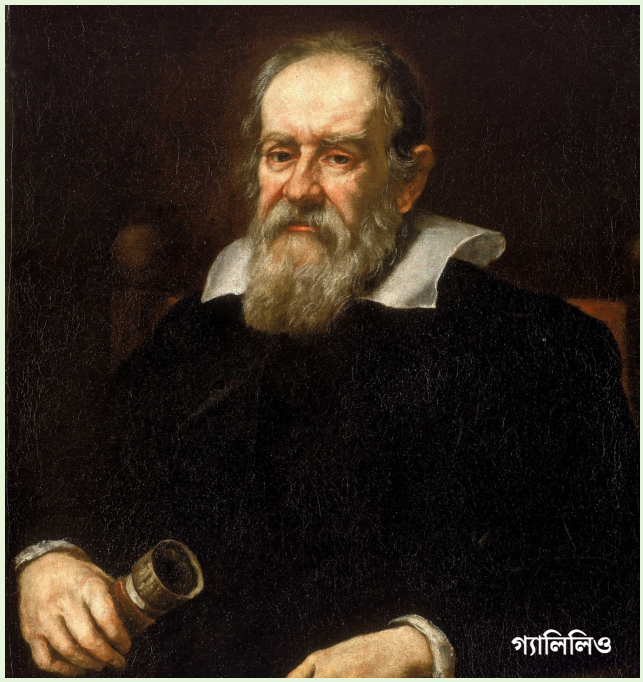
গ্যালিলিও

নেওয়া হল। তারপর রোমের রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল ব্রুনোকে। তাঁর ভস্ম নিকটস্থ টাইবার নদীতে ফেলা হয়েছিল। দিনটি ছিল 1600 সালের 17 ফেব্রুয়ারি। কোপারনিকাস সত্যের আলো জ্বালালেন, সে আলোর কথা প্রচার করলেন ব্রুনো, আর সেই আলোর শিখাকে এবার অনির্বাণ করে তুলবেন ইতালির গ্যালিলিও গ্যালিলি (1564–1642)। ●

*লেখক **শ্রী অরুণাভ দত্ত** জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানকর্মী। ইমেল: wrarunabha18@gmail.com*

১৫ পৃষ্ঠার পর ...

তাই হয়তো অনেক দেশে আইন করে যাতে এদের রক্ষা করা যায় সেইদিকে বেশী করে নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মানব যুগে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে এদের নাম খুব শোনা যায়। শোনা যায় প্রাচীন মিশর যুগে এই পাখিকে পবিত্র জ্ঞানে মানা হতো। বাইবেল ও কোরানে এই পাখির নামের উল্লেখ আছে। প্রাচীন পারস্য যুগে এই পাখিকে সততার প্রতীক হিসাবে গন্য করা হতো। আবার ইউরোপের কোনো কোনো জায়গাতে চোর হিসাবে গন্য করা হতো। আবার কোনো জায়গাতে এই পাখিকে মৃত্যুর প্রতীক ধরা হতো। এই রকমের অনেক গল্পই এই পাখিদের নিয়ে প্রচলিত আছে। তা যাইহোক

সুন্দর এই পাখি আমাদের এই পরিবেশে চিরকাল স্বমহিমাতে বিরাজ করুক এটা আমরা সব সময়ের জন্য সবাই চাই। পরিবেশ থেকে যাতে এরা কোনোদিন হারিয়ে না যায় আমাদের সেই দিকে সব সময়ের জন্য খুব নজর রাখতে হবে। প্রকৃতির সৃষ্টি এই সুন্দর পাখি আমাদের পরিবেশে চিরকাল বিরাজ করুক এটাই হয়তো সবাই আমরা চাই। এদের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিবেশের দরকার সেটা আমাদের আজ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওরা বাঁচলে আমরাও ওদের থেকে উপকার পাবো। ●

*লেখক **শ্রী তাপস কুমার দত্ত** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

পিথাগোরীয় ত্রয়ীদের মধ্যে কিছু বিন্যাসের সন্ধান

ভূপতি চক্রবর্তী

সমকোণী ত্রিভুজের বিশেষ একটি ধর্ম পিথাগোরাস তার বিখ্যাত ও অতি পরিচিত উপপাদ্যের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। একটি সমকোণী ত্রিভুজে যে অতিভুজের বর্গ তার দুটি বাহু বা ক্ষুদ্রতর পার্শ্ব দুটির বর্গের সমষ্ঠি হয় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম সেখান থেকে। তারপর থেকে গণিতবিদেরা এবং একদল গণিতে উৎসাহী মানুষ একদিকে চেষ্টা করেছেন সমকোণী ত্রিভুজের ওই ধর্মটিকে ভিন্ন রাস্তায় প্রমাণ করতে আর আরেকটি দল চেষ্টা করেছেন সমকোণী ত্রিভুজের জন্য তিনটি পার্শ্বকে অখন্ড রাশি হিসেবে খুঁজে পেতে।

দুটি কাজেই সাফল্য এসেছে, পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বা সমকোণী ত্রিভুজের ঐ বিশেষ ধর্ম প্রমাণ করার জন্য এখন আমাদের হাতে এসে গেছে প্রায় পৌনে চার'শটি পথ যাদের প্রত্যেকটিকেই বলা যায় পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রমাণ। অন্যদিকে অখন্ড সংখ্যা দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজের সবক'টি পার্শ্বকে খুঁজে পাওয়ার পথ প্রথম বলে দিয়ে গেছেন একাধিক গ্রীক গণিতবিদ যীশুখ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগেই।

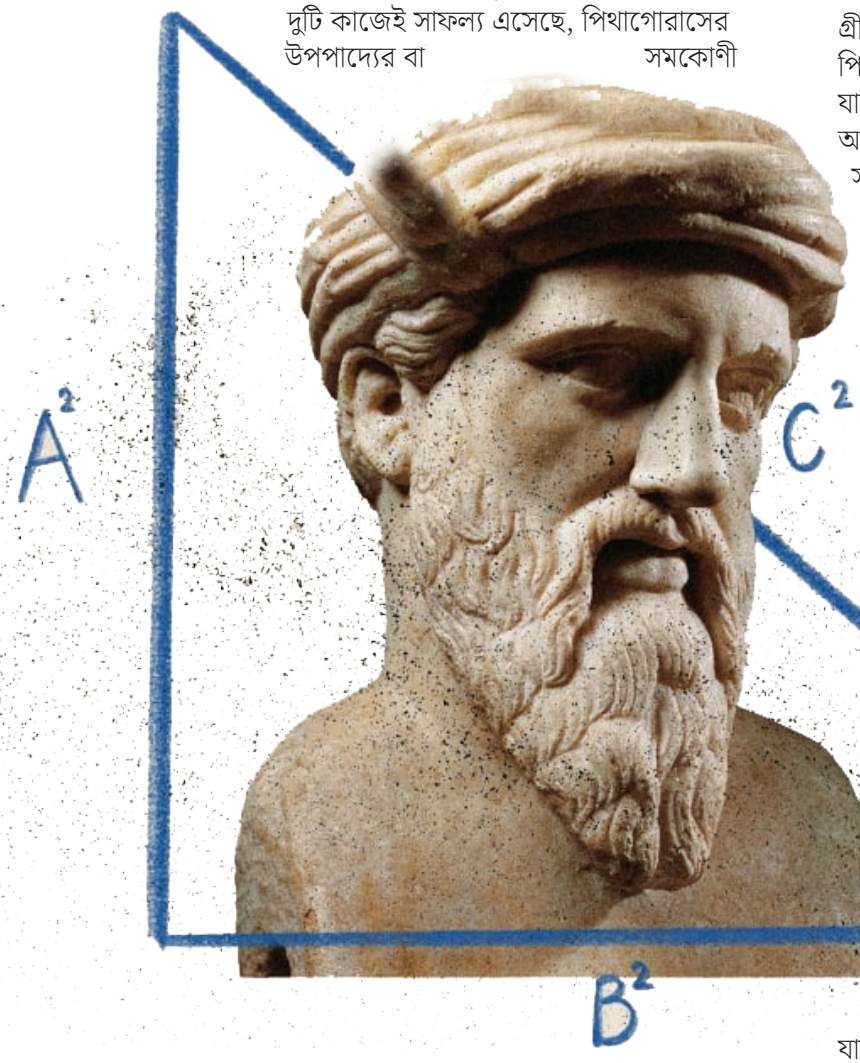

সেই পথগুলিতে একদিকে রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য আর অন্যদিকে দেখা গেছে কিছু সীমাবদ্ধতাও। অখন্ড সংখ্যা দিয়ে যখন একটি পিথাগোরীয় ত্রিভুজের তিনটি পার্শ্বকে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে তখন সেই তিনটি সংখ্যার দলটিকে বলা হচ্ছে পিথাগোরীয় ত্রয়ী। এই ত্রয়ীর তিন সদস্যের মধ্যে যদি কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে অর্থাৎ তাদের সকলকে একটি সাধারণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা সম্ভব না হয়, বা তারা যদি পরস্পরের সাপেক্ষে মৌলিক হয় তাহলে সেই ধরণের ত্রয়ী কেবল হয় মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী, আর তা নাহলে সেই দলটি নিছকই সাধারণ পিথাগোরীয় ত্রয়ী। তাই (5, 12, 13) একটি মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী কিন্তু (30, 40, 50) একটি সাধারণ পিথাগোরীয় ত্রয়ী, কারণ এখানে প্রতিটি সদস্যের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে 10।

মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিডের সূত্রটি খুবই কার্যকরী। মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ীর ক্ষেত্রে এই দুটি নির্মাতা সংখ্যা অর্থাৎ যাদের সাহায্যে তৈরি করে নেওয়া যাবে সমকোণী ত্রিভুজের অখন্ড পার্শ্বগুলি সেই m এবং n হবে দুটি ধনাত্মক অখন্ড সংখ্যা। এদের একটি জোড় ও অপরটি বিজোড় হবে ও তারা পরস্পরের সাপেক্ষে মৌলিক হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে থাকবে না কোন সাধারণ উৎপাদক।

ইউক্লিডের দেওয়া সূত্র থেকে মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ যেখানে a, b, c পরস্পরের মৌলিক হবে সেখানে $a = m^2 - n^2$; $b = 2mn$; $c = m^2 + n^2$ $(m>n)$ এখানে 'm' এবং 'n' দুটি অখন্ড ধনাত্মক সংখ্যা যার একটি যুগ্ম ও অপরটি অযুগ্ম সংখ্যা এবং যাদের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক নেই।

এই নিয়ম না মেনে m এবং n নির্বাচন করলে a, b, c এর যে অখন্ড মানগুলি পাওয়া যাবে তারা একটি পিথাগোরীয় ত্রয়ী গঠন করবে ঠিকই কিন্তু সেই ত্রয়ী মৌলিক হবে না, হবে সাধারণ ত্রয়ী। অবশ্য তাদের মধ্যে থেকে যদি সাধারণ উৎপাদক চিহ্নিত করে সবকটি বাহুকে সেই উৎপাদক দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আবার পাওয়া সম্ভব হবে একটি মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী। কিন্তু এই কাজটা সবসময় খুব সহজ হয় না, বিশেষ করে যখন খুব বড় সংখ্যা চলে আসে এবং তাদের সাধারণ উৎপাদকও হয়ে যেতে পারে বেশ বড় ও তাকে চট করে চেনা যায় না।

আমাদের কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে ত্রয়ীরা আদতে একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু সূচিত করছে আর তাই তারা প্রত্যেকেই একটি দৈর্ঘ্য তুলে ধরছে। অতএব তাদের সঙ্গে রয়েছে দৈর্ঘ্যের একক, তা সে মিটার, সেন্টিমিটার, ফুট বা কিলোমিটার যাই হোক না কেন। সেজন্য ত্রয়ীর একটি 3 মিটার হলে বাকী দুটি 4 মিটার ও 5 মিটার। পিথাগোরীয় ত্রয়ী খুঁজে বার করার নানা উপায়ের সন্ধান এখনও করা হচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে কেউ কেউ এমন পথের হদিশ দিচ্ছেন যেখানে কেবল মৌলিক ও সাধারণ পিথাগোরীয় ত্রয়ী মিলছে না, দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সংখ্যার বিচিত্র সব বিন্যাস। এইরকম কিছু উদাহরণ নিয়ে এই আলোচনা।

100 সংখ্যাটিকে যদি আমরা দুটি অখন্ড সংখ্যার সমষ্ঠি হিসেবে এমনভাবে দেখাতে পারি যেখানে দুটির মধ্যে একটি হবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে কী হয় দেখা যাক। যেমন আমরা লিখতে পারি

$100 = 99 + 1$, কিংবা $100 = 96 + 4$

প্রথম ক্ষেত্রে 99 এর সঙ্গে 1 যোগ করা হচ্ছে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 96 এর সঙ্গে পরবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা 4 যোগ করে পাওয়া যাচ্ছে সেই 100। এই ভাবে 100 থেকে ছোট সবকটি পূর্ণবর্গ সংখ্যার সঙ্গে উপযুক্ত অখন্ড সংখ্যা যোগ করে যা পাওয়া যাবে তা নীচের সারণিতে দেখানো হল। তাহলে যে নিয়মের কথা বলা হলো সেই নিয়ম মেনে নীচে 100 কে দুটি সংখ্যায় ভেঙে লেখা হলো এবং এভাবে পাওয়া সমষ্ঠি মোট ন'টি।

ইউক্লিড

1. $100 = 99 + 1$
2. $100 = 96 + 4$
3. $100 = 91 + 9$
4. $100 = 84 + 16$
5. $100 = 75 + 25$
6. $100 = 64 + 36$
7. $100 = 51 + 49$
8. $100 = 36 + 64$
9. $100 = 19 + 81$

(সম্পর্কগুচ্ছ A)

এবার প্রতিক্ষেত্রে যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাওয়া গেছে তার দিকে একটু নজর দিই। এই সংখ্যার সঙ্গে বাঁদিকে থাকা 100 কে যোগ করলে আমরা যে দৈর্ঘ্যটি পাব তাকে অতিভুজ হিসেবে নেওয়া যাক। এবার যদি ডানদিকে থাকা পূর্ণবর্গ ছাড়া অপর যে সংখ্যাটি রয়েছে তাকে নিলেই আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও আর একটি বাহু পেয়ে যাব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তারা উভয়েই অখন্ড সংখ্যা। বাঁদিকে এমনভাবে তৈরি করা সংখ্যার বর্গ থেকে ডানদিকে থাকা অপর সংখ্যাটির বর্গ বিয়োগ করি তাহলে পাওয়া যাবে আর একটি নতুন বর্গ সংখ্যা এবং এই তিনটি মিলে গঠন করবে একটি পিথাগোরীয় ত্রয়ী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

100 = 99 + 01—এই সম্পর্কটি থেকে এই নিয়ম মেনে আমরা 1 এর সঙ্গে 100 যোগ করে 101 এ পরিবর্তিত করে নিতে পারি। এবার এই 101 এবং ডানদিকের অন্য সংখ্যা 99 কে নিয়ে নিই তাহলেই আমার হাতে এসে যাবে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও একটি বাহু। কারণ,

$1012 - 992 = (020)^2$ $1012 = 992 + (020)^2$

অথবা বলা যায় 100 কে ওই ভাবে ভেঙে লিখে আমরা পিথাগোরীয় ত্রয়ীর একটি বাহু চিনে নিতে পারবো। পূর্ণবর্গ সংখ্যাটি ছাড়া (যেমন প্রথম ক্ষেত্রে 1 কে ছেড়ে দিলে পরে থাকছে 99) অপর যে সংখ্যা এসেছে তাকে ধরে মিলবে একটি বাহু। অতিভুজ পাওয়া যাবে 100 এর সঙ্গে সেই সংখ্যা যার পূর্ণবর্গ আমরা প্রথমে আলাদা করেছিলাম তাকে যোগ করে। আর তাহলে তৃতীয় বাহু পাওয়া তো যাবেই। বস্তুত সেই বাহুটিও হবে এক অখন্ড সংখ্যা। ফলে আমরা একটি পিথাগোরীয় ত্রয়ীর সবকটি সদস্যকেই পেয়ে যাবো। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক 9 নম্বর সম্পর্কটি থেকে শুরু করে;

$100 = 19 + 81$, এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে,

$(100 + 81)^2 = (181)^2$ এবং লেখা যায়

$(181)^2 - (19)^2 = (181 + 19)(181 - 19)$

$= 200 \times 162 = 400 \times 81 = (180)^2$

অথবা নিচে দেখানো পথেও এখানে পৌঁছনো যায়,

$(181)^2 = (19 + 162)^2 = (19)^2 + (162)^2 + 2 \cdot 162 \cdot 19$

$= (19)^2 + 162\,(162 + 38)$

$= (19)^2 + 162 \cdot 200 = (19)^2 + 324 \cdot 100$

$= (19)^2 + (180)^2$

তাহলে দাঁড়ালো

$(181)^2 = (19)^2 + (180)^2$

এর মধ্যে দিয়ে আমরা (19, 180, 181) পিথাগোরীয় ত্রয়ী পেয়ে যাচ্ছি। এটি একটি মৌলিক ত্রয়ী। অবশ্য এইভাবে উঠে আসা ত্রয়ী মৌলিক বা সাধারণ সব রকমেরই হতে পারে। কখন কীভাবে কোন ধরণের ত্রয়ী পাওয়া যাবে তা আমাদের আলোচনায় আসবে। এই পথে এগিয়ে আমরা সম্পর্কগুচ্ছ A

এর সবগুলি সম্পর্ক নিয়ে পিথাগোরীয় ত্রয়ী গঠন করে ফেলি;

1. $(101)^2 - 992 = (020)^2$ বা $(101)^2 = 992 + (020)^2$,
   অতএব ত্রয়ী (099, 020, 101)
2. $(104)^2 - (96)^2 = (040)^2$ বা $(104)^2 = (96)^2 + (040)^2$,
   অতএব ত্রয়ী (96, 040, 104)
3. $(109)^2 - (91)^2 = (060)^2$ বা $(109)^2 = (91)^2 + (060)^2$
   অতএব ত্রয়ী (91, 060, 109)
4. $(116)^2 - (84)^2 = (080)^2$ বা $(116)^2 = (84)^2 + (080)^2$
   অতএব ত্রয়ী (84, 080, 116)
5. $(125)^2 - (75)^2 = (100)^2$ বা $(125)^2 = (75)^2 + (100)^2$
   অতএব ত্রয়ী (75, 100, 125)
6. $(136)^2 - (64)^2 = (120)^2$ বা $(136)^2 = (64)^2 + (120)^2$
   অতএব ত্রয়ী (64, 120, 136)
7. $(149)^2 - (51)^2 = (140)^2$ বা $(149)^2 = (51)^2 + (140)^2$
   অতএব ত্রয়ী (51, 140, 149)
8. $(164)^2 - (36)^2 = (160)^2$ বা $(164)^2 = (36)^2 + (160)^2$
   অতএব ত্রয়ী (36, 160, 164)
9. $(181)^2 - (19)^2 = (180)^2$ বা $(181)^2 = (19)^2 + (180)^2$
   অতএব ত্রয়ী (19, 180, 181) **(সম্পর্কগুচ্ছ B)**

আগেই বলা হয়েছে যে এই ত্রয়ীগুলির মধ্যে মৌলিক ও সাধারণ দু রকমের ত্রয়ী লুকিয়ে রয়েছে। যে ত্রয়ীর সবক'টি সদস্যই জোড় সংখ্যা সেগুলি তো অবশ্যই সাধারণ ত্রয়ী হবে, কারণ তাদের মধ্যে যে সাধারণ উৎপাদক হিসেবে অন্তত দুই বা 2 উপস্থিত রয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই ক্রমিক সংখ্যা 2, 4, 6, 8 এ থাকা ত্রয়ীগুলি সবই সাধারণ ত্রয়ী। ক্রমিক সংখ্যা 5 এ যে ত্রয়ী রয়েছে তার অতিভুজ ও একটি বাহু বিজোড় আর অপর বাহুটি জোড়। আপাতদৃষ্টিতে এই ধরণের ত্রয়ীর মৌলিক ত্রয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সহজেই দেখা যাচ্ছে যে এই ত্রয়ীর সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ উৎপাদক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে 25। তাই এটিও মৌলিক নয়; একটি সাধারণ ত্রয়ী। ক্রমিক সংখ্যা 1, 3, 7, 9 এর ত্রয়ীর গঠনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে মৌলিক ত্রয়ীর বৈশিষ্ট্য (একটি বাহু ও অতিভুজ বিজোড় ও অন্য বাহুটি জোড়)। এবার তাদের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকলে তারা সত্যিকারের মৌলিক ত্রয়ী। ইউক্লিডের সূত্রের সাহায্য নিয়ে বা অন্য কোন উপযুক্ত পথে পরখ করে দেখলে বোঝা যাবে যে সত্যিই এগুলি মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী।

আমরা যদি এরকমভাবে একই পথে হেঁটে 10000 কে ওই 100 এর মত নিয়ম মেনে ভেঙে লিখতে শুরু করি তাহলে আমরা আর এক সেট সংখ্যা পেয়ে যাব যেমনটা আমরা পেয়েছিলাম সম্পর্কগুচ্ছ A এর মত একগুচ্ছ সম্পর্ক পেয়ে যাবো। যেমন,

1. $10000 = 9999 + 1 = 9999 + 1^2$; লেখা যায় $(10001)^2 = (9999)^2 + (10)^2$ ত্রয়ী হবে (10, 9999, 10001)
2. $10000 = 9996 + 4 = 9996 + 2^2$ লেখা যায় $(10004)^2 = (9996)^2 + (20)^2$ ত্রয়ী হবে (20, 9996, 10004)
3. $10000 = 9991 + 9 = 9991 + 3^2$ লেখা যায় $(10009)^2 = (9991)^2 + (30)^2$ ত্রয়ী হবে (30, 9991, 10009)

এইভাবে চলতে থাকবে। এই ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাবো 99 টি সম্পর্ক, কারণ 1 থেকে 99 পর্যন্ত সব কটি অখন্ড সংখ্যার বর্গ আমরা দ্বিতীয় স্থানে রাখতে পারবো যেহেতু 10000 হচ্ছে এর বর্গ যাকে 1 থেকে 99 পর্যন্ত যেকোন সংখ্যার বর্গ ও অবশিষ্ট একটি সংখ্যার সমষ্ঠি হিসেবে দেখানো যাবে। যেমন এই শ্রেণির তৃতীয় সদস্যের মধ্যে রয়েছে 3 এর বর্গ ঠিক সেই ছন্দে এগিয়ে চলে আমরা 99 টি সম্পর্ক পেতে পারি যার কয়েকটি নিচে দেখানো হল। তবে আমরা এখানে ক্রমিক সংখ্যা হিসেবে ওই 99 টির দলের ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছি। যেমন,

8. $10000 = 9936 + 64 = 9936 + 8^2$
   ত্রয়ী হবে (1600, 9936, 10064)

আমরা এখানে 10000 এর সঙ্গে 64কে যোগ করে পেয়ে গেছি সম্ভাব্য ত্রয়ীর বৃহত্তম বাহু অর্থাৎ অতিভুজকে। আর একটি পার্শ্ব যে 9936 হবে তা জানা আছে তাই সহজেই তৃতীয় বাহু পাওয়া গেল এবং প্রত্যাশিত ভাবেই তার মান হলো 1600।

13. $10000 = 9831 + 169 = 9831 + 13^2$
    এখান থেকে যে ত্রয়ী পাওয়া যাবে, (9832, 2600, 10169)
21. $10000 = 9559 + 441 = 9559 + 21^2$
    এখান থেকে যে ত্রয়ী পাওয়া যাবে, (9559, 4200, 10441)
35. $10000 = 8775 + 1225$
43. $10000 = 8151 + 1849$
57. $10000 = 6751 + 3249 = 6751 + (57)^2$

লেখা যায় $(13249)^2 = (6751)^2 + (11400)^2$

ত্রয়ী হবে (11400, 6751, 13249)

এইভাবে চলতে থাকবে। এই ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাবো 99 টি সম্পর্ক, কারণ 1 থেকে 99 পর্যন্ত সব কটি অখন্ড সংখ্যার বর্গ আমরা দ্বিতীয় স্থানে রাখতে পারবো যেহেতু 10000 হচ্ছে এর বর্গ যাকে 1 থেকে 99 পর্যন্ত যেকোন সংখ্যার বর্গ ও অবশিষ্ট একটি সংখ্যার সমষ্ঠি হিসেবে দেখানো যাবে।

আমরা যে সম্পর্কগুলি নিয়ে কাজ করেছি তার বাঁদিকে প্রথমে রেখেছি 100 তারপর 10000। এখানে 1000 জায়গা পায় নি। ফলে একটা বিষয় নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। বাঁদিকে আমাদের রাখতে হবে 100 বা 10000 এর মত একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা যেখানে 10 এর ঘাত একটি জোড় বা যুগ্ম সংখ্যা। আমরা কাজ করেছি 10^2 বা 10^4 নিয়ে কিন্তু বাদ থেকে যাবে 10 এর বিযুগ্ম ঘাত 10^3 বা এক হাজার। তাই এক লক্ষ

n এর মান	10^n এর মান	y এর মান	ইউক্লিডের সূত্রের সমতুল m	ইউক্লিডের সূত্রের সমতুল n	পিথাগোরীয় ত্রয়ী	ত্রয়ীর প্রকৃতি
0	1	1	গ্রহণযোগ্য নয়	গ্রহণযোগ্য নয়	পাওয়া যাবে না	
0	1	2	2	1	3, 4, 5	মৌলিক
1	10	1	10	1	20, 99, 101	মৌলিক
1	10	2	10	2	40, 96, 104	8 (5, 12, 13)
1	10	3	10	3	60, 91, 109	মৌলিক
1	10	4	10	4	80, 84, 116	4 (20, 21, 29)
1	10	5	10	5	75, 100, 125	25 (3, 4, 5)
2	100	1	100	1	200, 9999, 10001	মৌলিক
2	100	2	100	2	400, 9996, 10004	4 (100, 2499, 2501)

100000 বা 10^5 সেখানে জায়গা পাবে না কারণ তা একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় বা 10 এর ঘাত সেখানে যুগ্ম সংখ্যা নয়। ফলে এই নিয়ম মেনে 10000 এর পরে আসবে 1000000 বা 10^6 । যেহেতু 10^6 কে $(1000)^2$ হিসেবে লেখা যায় তাই এক্ষেত্রে আমরা 999 টি সম্পর্ক লিখতে পারবো যার প্রথম হবে

$(1000)^2 = 1000000 = 999999 + 1$

আর তারপর দশ লক্ষের সঙ্গে এক যোগ দিয়ে মিলে যাবে অতিভুজ আর অন্যদুটি পার্শ্বের একটি হবে 999999। সুতরাং ত্রয়ী পেতে এখানেও অসুবিধা নেই। আর আগে দেখা সাম্য বা ছন্দ থেকে এটাও এবার বলা যাচ্ছে যে সমকোণী ত্রিভুজের অন্য পার্শ্বটি হবে 20000 ।

$(1000001)^2 = (999999)^2 + (20000)^2$

শেষ করার আগে আমাদের উচিত হবে একবার এই পদ্ধতির সাধারণ সূত্রটিকে দেখে নেওয়া।

আমরা লিখতে পারি

$(10)^{2n} = x + y^2$ (এখানে n একটি অখন্ড সংখ্যা) **(1)**

এবার অতিভুজ হিসেবে আমরা নেবো $(10^{2n} + y^2)$ দৈর্ঘ্যকে আর অন্য একটি বাহু হিসেবে নেব x কে, যার মান (1) সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, $(10^{2n} - y^2)$ । আমরা এবার দেখবো যে এই অতিভুজ আর x বাহুটির বর্গের অন্তর একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে কিনা। কিংবা বলা যায়, এইপথে এক পূর্ণবর্গ সংখ্যার হদিশ পেলেই পাওয়া যাবে পিথাগোরীয় ত্রয়ী।

$(10^{2n} + y^2)^2 - (10^{2n} - y^2)^2$

$= (10^{2n} + y^2 + 10^{2n} - y^2)(10^{2n} + y^2 - 10^{2n} + y^2)$

$= 4y^2 \cdot 10^{2n} = (2y \cdot 10^{2n})^2$

[একটি পূর্ণবর্গ অখন্ড সংখ্যা]

তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি পার্শ্ব হবে $(2y \cdot 10^n , 10^{2n} - y^2, 10^{2n} + y^2)$

লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে 10n এর ভূমিকা হচ্ছে ইউক্লিডের সূত্রের m এর মত, আর y এর ভূমিকা হচ্ছে ওই সূত্রের n এর মত। তবে ইউক্লিডের সূত্র যেমন মৌলিক ত্রয়ী তৈরি করার ক্ষেত্রে m এবং n এর নির্বাচনের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে তা কিন্তু এখানে অনুপস্থিত। তাই এখানে কেবল মৌলিক নয়, পাওয়া যাবে সাধারণ ত্রয়ীদেরও। উপরের সারণিতে বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে। আর এখানে খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে যে কেন 10 এর জোড় ঘাতের জন্য এইভাবে সম্পর্ক পাওয়া যেতে পারে বিজোড় ঘাতের জন্য নয়।

পিথাগোরীয় ত্রয়ীর নানা ধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও কিছু চর্চা হয়। খুব চেনা বিষয় থেকেও উঠে আসে নতুন উপাদান। এই চর্চাই গণিত তথা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আর এখান থেকেই মেলে নতুন পথের দিশা। তাই সুপ্রাচীন পিথাগোরীয় ত্রয়ী তার আকর্ষণ এখনও হারায় নি। ●

সাহায্যসূত্র:

Inder J. Taneja; Pandigital-Type and Pythagorean Triples Patterns, Zenodo, March 17, 2021, pp. 1-750, https://doi.org/10.5281/zenodo.4611511

লেখক ***ড. ভূপতি চক্রবর্তী*** *কলকাতায় সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabhu@gmail.com

পরিবেশের সেকাল

মোহিত রায়

পরিবেশ আমাদের চারিদিকের বসবাসের অঞ্চল—জীব ও জড় সবাইকে নিয়েই। অরণ্য, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ নিয়ে প্রকৃতি সারা বিশ্বের সবকোণ জুড়ে। প্রকৃতি সবসময়ই বিরাজমান, আর সেই প্রকৃতিতে মানুষ জীবনধারণের জন্য পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষের প্রাথমিক চিন্তা ছিল প্রকৃতিকে নিয়েই। তাকে সে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, আবার সুযোগ পেলেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, শাসন করেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের শুরুর থেকেই তাই একটি ভীতি-মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে, প্রকৃতি-উপাসনা হয়ে উঠেছে প্রাচীন ধর্মেরই অঙ্গ। প্রাচীন সভ্যতার অনেকগুলিরই লিখিত বিবরণ না থাকায় সব ক্ষেত্রে প্রকৃতি উপাসনার বিশদ আমরা জানতে পারি না। তবে শিলালিপিতে সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির উপস্থিতি জানিয়ে দেয় যে প্রকৃতির শক্তিগুলির প্রতি তাদের সম্মান জ্ঞাপনের কথা। যেসব সভ্যতার ভাষা পড়া গেছে সেগুলি জানিয়েছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মানব সভ্যতার আত্মিক যোগের কথা। পাঁচ হাজার বছর আগের মিশরের সভ্যতায় প্রাকৃতিক শক্তি, পশু-পাখিরা দেবতার সম্মান পেয়ে এসেছে। মিশরীয় সভ্যতায় অনেক রকমের দেবদেবী, শৃগাল থেকে সূর্য—সবারই স্থান ছিল। প্রায় সমপ্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার প্রধান দেবী ছিলেন পৃথিবী ও দেবতা ছিলেন আকাশ।

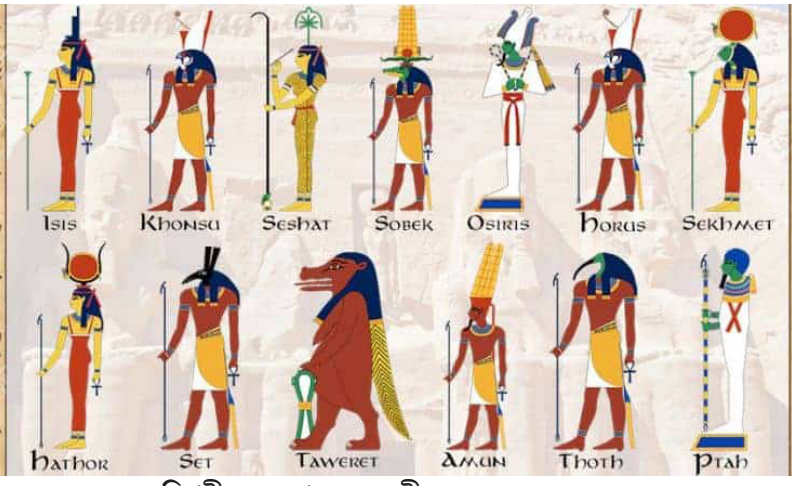

মিশরীয় সভ্যতার দেবদেবী

পৃথিবীর দুটি প্রাচীনতম সভ্যতা এখনো চলমান রয়েছে চীন ও ভারতে। চীনের সভ্যতায় প্রকৃতি ভাবনা এসেছে শক্তির রূপ ধরে। ভগবান-দেবদেবী সেখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি, ধর্ম সেখানে জীবনযাত্রার দিশা। চীনের দুটি প্রধান মতবাদের গুরু কনফুসিয়াস এবং লাওৎসে। সেখানে প্রকৃতির দুটি শক্তি "ইন" ও "ইয়াং"—শুভ অশুভ, কখনো তা পুরুষ ও প্রকৃতি এবং পঞ্চবস্তু দিয়ে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই পঞ্চবস্তু হল জল, কাঠ, আগুন, ধাতু ও পৃথিবী বা মাটি।

ইন ও ইয়াং

ভারতীয় সভ্যতার শুরু পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সিন্ধু-সরস্বতী অববাহিকায়। এই সভ্যতার লিপি এখনও পড়া যায়নি, ফলে অনেক কিছুই অজানা। তবে মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে এক দেবতার ছবি যার মাথায় শিং এবং তিনি পশু পরিবৃত। একেই মনে করা হচ্ছে আদি পশুপতি। এর পরে আর্য সভ্যতা। সাড়ে তিন হাজার বছর আগের রচিত ঋগ্বেদ প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য। ঋগ্বেদে আমরা পাই সূর্য, চন্দ্র, বৃষ্টির দেবতা বরুন ও কৃষির দেবতা ক্ষেত্রপতির বর্ণনা ও বন্দনা। ঋগ্বেদে রয়েছে পশুপালনের কথা, তাদের যত্নের কথা। সামবেদ গানের বেদ। এখানে পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য মেঘ থেকে বৃষ্টি, তা থেকে ধরিত্রীর শস্যশ্যামলা হওয়া—জলচক্রের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মেঘের কথা, বজ্রের দেবতা ইন্দ্রের কথা যিনি বৃষ্টিপাতের সহায়ক। যজুর্বেদে রয়েছে কৃষি কার্যের বর্ণনা, ওষধির রোগ মুক্তির ক্ষমতার কথা। পৃথিবী ও প্রকৃতির জন্য মানুষের শ্রদ্ধার কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে অথর্ব বেদের পৃথিবীসূক্ত মন্ত্রগুলিতে। পৃথিবীর পূজিত হচ্ছেন তার অকৃপণ শস্য ও জলদানের জন্য, তার অপার সৌন্দর্যের জন্য, তার ক্রোড়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, পশুপাখি সবাইকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য।

বেদ-বেদান্তের যুগের পর আবির্ভূত হলো আরেকটি ভারতীয় ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, যার দর্শন পরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বে। বৌদ্ধ ধর্মে কোন মহান ঈশ্বর নেই বা বৈদিক প্রকৃতি বর্ণনা নেই কিন্তু আছে সব জীবের প্রতি করুণা ও সহমর্মিতার কথা। সব্বে সুখীতা হন্তু, সুখী আত্তানাং পরিহবন্তু—সবাই সুখী হোক, শত্রুহীন হোক—এই 'সবাই' অর্থ পুরো প্রাণীজগৎটাই। বুদ্ধের বিভিন্নবার জন্মের গল্প হলো জাতককাহিনী যেখানে তিনি পশুপাখি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পশুপাখি কেউ মনুষ্যেতর নয়। এছাড়া বিভিন্ন

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ

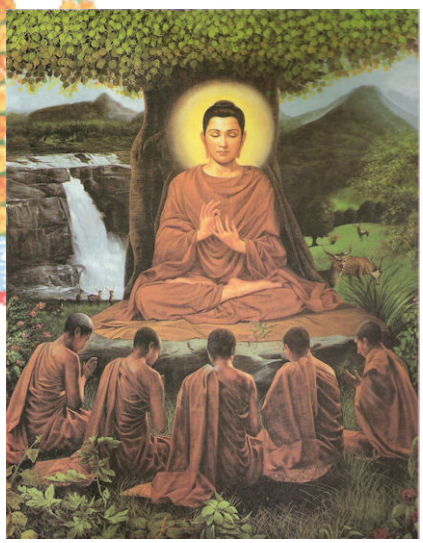

শিষ্যসহ বুদ্ধ

জাতকে রয়েছে বৃক্ষদেবতার কথা। বোধিবৃক্ষ তাই চিরপূজ্য।

দর্শনের পর আসা যাক কিছু বৈষয়িক শাস্ত্রের কথায়। আজ থেকে প্রায় 2300 বছর আগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রকৃতিকে বন্দনা করে তার সংরক্ষণে কি কি করতে হবে তার নির্দেশ রয়েছে। অরণ্য রক্ষার জন্য আধিকারিক নিয়োগ, কি কি ধরনের বৃক্ষের প্রতি যত্নবান হতে হবে, অরণ্যের ক্ষতি করলে শাস্তিবিধান—সবই বলা হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। এর কয়েকশো বছর পর ভারতীয় সমাজে সামাজিক ও নৈতিক আচার সংহিতার সংকলন তৈরি হল যার নাম মনুস্মৃতি। মনুস্মৃতিতে আমরা পরিবেশ দূষণের বিষয়টি প্রথম সরাসরি পেলাম। সেখানে বলা হল রাজপথ পরিষ্কার রাখতে হবে, মলমুত্র স্নানের জল ও অন্যান্য বর্জ অনেক দূরে ফেলতে হবে, জলে কেউ মল-মূত্র ত্যাগ করবে না বা বিষাক্ত দ্রব্য ফেলবে না, বৃক্ষের প্রয়োজনীয় শাখা পর্যন্ত কেউ কাটতে পারবে না ইত্যাদি। আর এইসব অন্যায় করলে তার শাস্তিবিধানের কথাও লেখা রয়েছে।

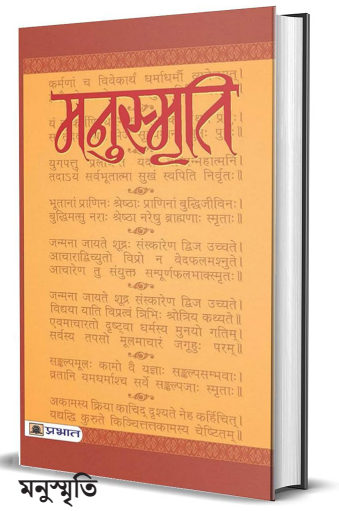

মনুস্মৃতি

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা গ্রীক সভ্যতা। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় প্রকৃতি এই

গ্রীকদের দেবদেবী

সম্মান পায়নি। গ্রীকদের অনেক দেবদেবী থাকলেও তারা ছিলেন মানুষের আদলেই। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলেছেন যে প্রকৃতি যা সৃষ্টি করেছে তা সব মানুষের জন্য। পশুপাখি, উদ্ভিদ—সব হলো মানুষের ব্যবহারের জন্য। প্রাচীন এইসব সভ্যতাগুলিতে কোন একক ক্ষমতাশালীন সব সিদ্ধান্তের অধিকারী ঈশ্বর নেই। এরপরে ইউরোপও মধ্যপ্রাচ্যে দুটি পরস্পর সম্পর্কিত ধর্মীয় ভাবনা প্রসারিত হলো—খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম। এই ধর্ম গুলিতে রয়েছেন এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—যিনি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সর্বময়কর্তা। ঈশ্বর বললেন, তবেই পৃথিবী আলোকিত হল। প্রকৃতির নিজস্ব ভূমিকা শেষ হল। বাইবেলে এই ঈশ্বর বললেন যে আমাদের চেহারার মতন করে মানুষকে বানাও আর পৃথিবীর যাবৎ প্রাণী-উদ্ভিদের মালিক হবে মানুষ। মানুষের প্রকৃতির আত্মিক সংযোগ শেষ হল। ইউরোপে এই আত্মিক সংযোগ ফিরতে সময় লেগেছিল আরো দেড় হাজার বছরেরও বেশি। ●

লেখক ***শ্রী মোহিত রায়*** *একজন পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: mohitkray@gmail.com*

মিউ সেফেই

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

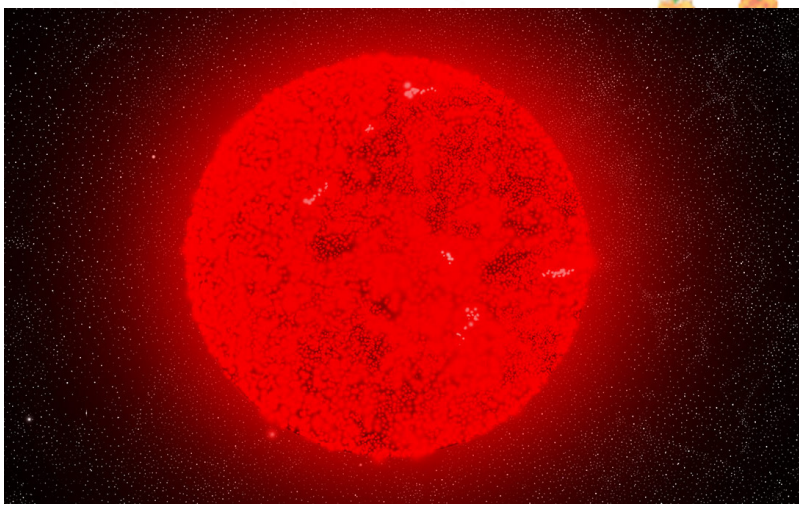

দানব কি বলছি, এ তো মহাদানব নক্ষত্র, সুপারজায়ান্ট স্টার "মিউ সেফেই"। সূর্যের চেয়ে প্রায় 1500 গুণ বড়ো আকারের এবং প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি উজ্জ্বল এই নক্ষত্রটি আনুমানিক 2800 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত; ওই নিসর্গের সমগ্র ছায়াপথের মধ্যস্থিত বৃহত্তম নক্ষত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মিউ সেফেই।

সম্প্রতি আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা কতৃক প্রকাশিত মিউ সেফেই এর একটি ছবি বিজ্ঞানীমহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। ছবিটি তুলেছেন পোর্তুগালের লিসবন-স্থিত মহাকাশ চিত্রগ্রাহক ডেভিড ক্রুজ। আশঙ্কা রয়েছে এই বৃহত্তম নক্ষত্রটির মধ্যে মারাত্মক রকমের মহাকাশ-ঝঞ্ঝা সুপারনোভা ঘটতে পারে এবং তারাটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। তবে এই দানব নক্ষত্রটি ধ্বংস হয়ে গেলেও সুপারনোভার কারণে ছোট ছোট শিশু নক্ষত্রেরও জন্ম হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

ওই রহস্যমন্ডিত ব্রহ্মান্ডের বুকে সেফিয়াস তারামন্ডলের মধ্যে "IC 1396" নীহারিকার প্রান্তে গাঢ় তামড়ি লাল রঙের এই দানব মিউ সেফেই নক্ষত্রটি অবস্থিত, এর ডানদিকে রয়েছে উজ্জ্বল তারা আলফা সেফেই, যার অপর নাম অল্ডারামিন। আমাদের গ্রহ পৃথিবী থেকে বাইনোকুলার দিয়ে এই নক্ষত্রটিকে দেখা যায়। মিউ সেফেই নক্ষত্রটির ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের চেয়ে প্রায় 1000 গুণ বড়ো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই তারাটিকে যদি আমাদের সৌরজগতে সূর্যের অবস্থানে বসানো হয়, তাহলে এটি তার বিশাল আকৃতির জন্য মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ হয়তো গিলে খাবে। এই নক্ষত্রটির দূরত্ব আনুমানিক 2800 আলোকবর্ষ মনে করা হলেও, এর সঠিক দূরত্ব আজও জানা সম্ভব হয়নি। তবে 1989 খ্রীস্টাব্দে ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি কতৃক প্রেরিত হিপ্পারকস্ উপগ্রহ থেকে এর একটি আনুমানিক দূরত্বের মাপ জানা যায়। মনে করা হয় এর দূরত্ব 1800 পারসেক, যেখানে 1 পারসেক 3.26 আলোকবর্ষের সমান, 1 আলোকবর্ষ 9.5 ট্রিলিয়ন কিলোমিটার বা 6 ট্রিলিয়ন মাইলের সমান। এই উপগ্রহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রটির দূরত্ব প্রায় 30.7 ট্রিলিয়ন কিলোমিটার বা 19.2 ট্রিলিয়ন মাইল।

রহস্যমন্ডিত ব্রহ্মান্ডের বুকে সেফিয়াস তারামন্ডলের মধ্যে "IC 1396" নীহারিকার প্রান্তে গাঢ় তামড়ি লাল রঙের এই দানব মিউ সেফেই নক্ষত্রটি অবস্থিত, এর ডানদিকে রয়েছে উজ্জ্বল তারা আলফা সেফেই, যার অপর নাম অল্ডারামিন।

মহাকাশের অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় এই নক্ষত্রটি অনেক বেশি ঠাণ্ডা, এবং সেই জন্যই সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি লাল। সর্বপ্রথম 1783 খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান-ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক উইলিয়াম হার্শেল তাঁর ফিলোজফিক্যাল ট্রানজাকশন নামক বইতে "স্টারস্ নিউলি কাম টু বি ভিজিবল্" অধ্যায়ে মিউ সেফেই নক্ষত্রটিকে একটি খুব সুন্দর গাঢ় তামড়ি লাল রঙের নক্ষত্র হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। সেই জন্যই এই নক্ষত্রটি বিজ্ঞানী সমাজে 'হার্শেলস্ গার্নেট স্টার' হিসেবে জনপ্রিয়। তবে 1792–1813 খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইতালির স্বনামধন্য ক্যাথলিক পুরোহিত এবং একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী গিয়ুসেপ্পে পিঁয়াজি এই তারাটিকে 'গার্নেট সাইডাস' বলে চিহ্নিত করেছেন। 1899 খ্রীস্টাব্দে রিচার্ড হিন্কলী অ্যালেনের লেখা বিখ্যাত বই "স্টার নেম: দেয়ার লোর অ্যান্ড মিনিং"-এ উল্লেখ আছে, চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যোতির্বিদ অ্যান্টোনিয়ো বীভার এই নক্ষত্রটিকে 'এরাকিস' নামে পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়াও এই দানব নক্ষত্রটি 'HD 206936', 'HR 8316', 'HIP 107259', 'SAO 33693' নামেও পরিচিত।

এই সুবিশাল নক্ষত্রটির নামকরণ মিউ সেফেই হওয়ার পেছনে রয়েছে এর উৎসস্থল তারামন্ডল সেফিয়াসের লাতিন নামের ব্যকরণগত গঠনের উপর। 1603 খ্রীস্টাব্দে মহাকাশ বিজ্ঞানী জোহান বেয়ার তাঁর নতুন নক্ষত্র-মানচিত্রাবলী 'ইউরানোমেট্রিয়া' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বেয়ার ডেস্টিনেশনের কথা বলা হয়েছে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে প্রত্যেকটি তারাকে তাদের উৎসস্থানীয় তারামন্ডলের নামের গ্রীক বা লাতিন অক্ষরের সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞানী বেয়ারের ডেস্টিনেশনে প্রায় 1564টি এমনই নক্ষত্র রয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ীই এই দানব নক্ষত্রটির নামকরণ

লাতিন সঙ্কেত “মিউ” অনুসারে হয়েছে মিউ সেফেই। অনেক সময় এই তারাটিকে সংক্ষেপে মিউ সেপ বলেও ডাকা হয়।

মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতা ও পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে কখনো এটিকে সুপারজায়ান্ট স্টার, তো কখনো কখনো আবার হাইপারজায়ান্ট স্টারও বলা হয়ে থাকে। হাইপারজায়ান্ট স্টার হলো একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য নক্ষত্র-শ্রেণী যাদের উজ্জ্বলতা অত্যন্ত বেশী এবং আকারে মাত্রাতিরিক্ত বড়ো, কিন্তু সেই তুলনায় ভর কম, এর কারণ অত্যধিক অন্তঃস্থ নাক্ষত্রিক বাতাস। নিসর্গবিদদের মতে মিউ সেফেই হলো ইয়ার্কিস I শ্রেণীর ‘K’ বা ‘M’ বর্ণালী শ্রেণীর একটি সুপারজায়ান্ট স্টার।

1943 খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার উইসকনসিনে অবস্থিত ইয়ার্কিস অবজারভেটরী থেকে উদ্ভূত ‘দ্য ইয়ার্কিস স্পেক্ট্রাল ক্লাসিফিকেশন’-এর নামে নক্ষত্রদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নির্ধারণের জন্য উজ্জ্বলতা ও পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রার ভিত্তিতে একটি দ্বিমাত্রিক পদ্ধতির প্রচলন হয়। এই পদ্ধতিতে কোন একটি নক্ষত্র থেকে আগত তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হয়; যেখানে বর্ণালী রেখা গুলো নক্ষত্রের বহির্ভাগ থেকে নির্গত আলোর তাপমাত্রা নির্দেশ করে এবং বর্ণালীটি কতটা চওড়া সেটা ওই তারার উজ্জ্বলতার নির্দেশক। আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম উইলসন মর্গান, ফিলিপ সি কীনান এবং এডিথ কেলম্যানের নামানুসারে এই পদ্ধতির নামকরণ হয় মর্গান-কীনান-কেলম্যান পদ্ধতি। এই নিয়মানুসারে তাপমাত্রার তারতম্য বোঝাতে ইংরেজি বর্ণমালার O, B, A, F, G, K এবং M অক্ষরগুলো যথাক্রমে ব্যবহার করা হয়; যেখানে ‘O’ উষ্ণতম নক্ষত্রটিকে নির্দেশ করে এবং ‘M’ শীতলতম নক্ষত্রটিকে। প্রত্যেকটি বর্ণ আবার দশটি সংখ্যাগত উপ-বিভাগে বিভক্ত, যথাক্রমে শুন্য (0) থেকে নয় (9) পর্যন্ত। 0 উষ্ণতম ও 9 শীতলতম বৈশিষ্ট্যর সূচক। ঠিক তেমনি উজ্জ্বলতা বোঝাতে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়। শ্রেণী I বোঝাতে সুপারজায়ান্ট, শ্রেণী II বোঝাতে ব্রাইটজায়ান্ট, শ্রেণী III বোঝাতে রেগুলারজায়ান্ট, শ্রেণী IV সাবজায়ান্ট, শ্রেণী V বোঝাতে মেইন সিকোয়েন্স স্টার বোঝানো হয়। এছাড়াও আরও নানাবিধ সংকেত ব্যবহার করা হয় বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে, যেমন স্ল্যাশ (/) বোঝাতে যে কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, আবার ড্যাশ (–) বোঝাতে দুটি শ্রেণীর উভয়ের অন্তর্ভুক্তী নির্দেশ করে। এই শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের সৌরজগতের মহামহিম সূর্য একটি মেইন সিকোয়েন্স স্টার, যার বর্ণালী শ্রেণী হলো “G2V”, এবং মিউ সেফেই হলো একটি সুপারজায়ান্ট স্টার যার বর্ণালী শ্রেণী হলো “M2-Ia”। তবে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় এর শ্রেণীবিন্যাস সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, নতুন শ্রেণী হলো “M2-Ia”।

এই তারাটির বহিঃপৃষ্ঠ এর ব্যাসার্ধ ওই তারার ব্যাসার্ধের প্রায় 0.33 গুণ, যার তাপমাত্রা প্রায় 2055 কেলভিন। এই বহিঃপৃষ্ঠে আণবিক গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড, সিলিকন অক্সাইড রয়েছে। ইনফ্রারেড রশ্মি দিয়ে দেখা গেছে এই নক্ষত্রটির অন্তঃপৃষ্ঠের ব্যাসার্ধ প্রায় চার গুণ এবং সেখানে জল ও ধূলিকণার বলয় দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই টোরাসাকৃতি অর্ধবৃত্তাকার পৃষ্ঠতলের আনুমানিক বয়স প্রায় 2–3 হাজার বছর। 1848 খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ নিসর্গবিদ জন রাসেল হিন্দ আবিষ্কার করেন যে এই নক্ষত্রটি আসলেই একটি ভ্যারিয়েবল স্টার, যার উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর। এই ঘটনার পরপরই জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক উইলহেল্ম আর্গেল্যান্ডার এই নক্ষত্রটির ভেরিয়েএবিলিটি সুনিশ্চিত করেন। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে আনুমানিক 860–4400 দিনের মধ্যে এই নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতার বিস্তার 3.4–5.1 এককের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। 1881 খ্রীস্টাব্দ থেকে এই তারাটির পরিবর্তনশীলতা রেকর্ড করা হচ্ছে নিয়মিত ভাবে। 1943 খ্রীস্টাব্দ থেকে এই নক্ষত্রটির বর্ণালীকে প্রমাণ হিসেবে ধরে বিজ্ঞানীরা অন্যান্য নক্ষত্রের শ্রেণীবিন্যাস করে থাকেন।

সাম্প্রতিক নাক্ষত্রিক বিবর্তন পর্যায়ের গবেষণায় বোঝা গেছে যে, এই সুবিশাল নক্ষত্রটি শেষ পর্যন্ত তার অন্তঃস্থ সুপারনোভার কারণে বিস্ফোটন ঘটাবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই দানবাকৃতি নক্ষত্রটির বিরাট আকার এই ঘটনা ঘটার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত। এই তারাটি তার কেন্দ্রস্থলে সমস্ত উপাদানকে লোহায় রুপান্তরিত করে, ফলে সুপারনোভা নামে মহাকাশ-বিস্ফোটন ঘটার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। যেখানে সমস্ত মেইন সিকোয়েন্স স্টার হাইড্রোজেন কে তাপ ও চাপের দ্বারা হিলিয়ামের পরিণত করে, সেখানে মিউ সেফেই হিলিয়ামকে কার্বনে পরিণত করে। ফলে এই দানব নক্ষত্রের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ধ্বংসাবশেষ হিসেবে আমরা হয়তো পাব কিছু মহাজাগতিক নুড়ি ও কৃষ্ণগহ্বর। তবে আমরা এই সুবিশাল নক্ষত্রটিকে অদূর ভবিষ্যতে হারিয়ে ফেললেও ওই মহাজাগতিক নুড়ি থেকে আবার শিশু নক্ষত্রের জন্ম হতে পারে। হয়তো আবার ওই অন্তরীক্ষে অসংখ্য নক্ষত্রের হাট বসবে!

*লেখক **শ্রী তুহিন সাজ্জাদ সেখ** বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: sk.sajjadtuhin14@gmail.com*

নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

ফ্রেডেরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং

স্যার ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং 14 নভেম্বর, 1891 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন কানাডিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। 1923 সালে, ব্যান্টিং ইনসুলিন এবং মধুমেহ রোগে এর প্রয়োগ সম্ভাবনার সহ-আবিষ্কারক হিসাবে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পান। ফ্রেডরিক ব্যান্টিং, চিকিৎসাবিদ্যায় এখন পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী যিনি মাত্র 32 বছর বয়সে এই সম্মান লাভ করেন। 1910 সালে, তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিক্টোরিয়া কলেজে জেনারেল আর্টস বিষয়ে ভর্তি হন। তার প্রথম বছরে ব্যর্থ হওয়ার পর, তিনি 1912 সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তি হন। ব্যান্টিং 1915 সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ নেন। তিনি 1916 সালের ডিসেম্বরে স্নাতক হন এবং পরের দিনই সামরিক অভিযানে যোগ দেন। তিনি 1918 সালে ক্যামব্রিয়ের যুদ্ধে আহত হন। নিজে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ষোল ঘন্টা অন্যান্য আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করেছিলেন, যতক্ষণ না অন্য একজন ডাক্তার রোগীদের দায়িত্ব নেন। বীরত্বের জন্য তিনি 1919 সালে মিলিটারি ক্রস লাভ করেন। অগ্ন্যাশয় সম্পর্কে একটি নিবন্ধ ডায়াবেটিসের প্রতি ব্যান্টিংয়ের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। তখন বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে অগ্ন্যাশয়ে ল্যাঙ্গারহ্যান্সের কোষপুঞ্জ থেকে নিঃসৃত একটি প্রোটিন হরমোনের অভাবের কারণে ডায়াবেটিস হয়। এই বিশেষ হরমোনের নাম রাখা হয়েছিল "ইনসুলিন"। এই হরমোন চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর অভাব রক্তে শর্করার বৃদ্ধির পায়। অগ্ন্যাশয়ের প্রোটিওলাইসিস এনজাইম দ্বারা ইনসুলিনের ধ্বংসের কারণে অগ্ন্যাশয় কোষ থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। চ্যালেঞ্জ ছিল অগ্ন্যাশয় ধ্বংসের আগে ইনসুলিন নিষ্কাশনের উপায় খুঁজে বের করা। অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত ট্রিপসিন ইনসুলিনকে ভেঙে দেয়, কিন্তু এটি ল্যাঙ্গারহ্যান্সের কোষগুলিকে অক্ষত রাখে। ব্যান্টিং বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনোভাবে ট্রিপসিন-নিঃসরণকারী কোষগুলিকে ধ্বংস করতে পারলে ইনসুলিন নিষ্কাশন সম্ভব। ব্যান্টিং টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজির অধ্যাপক জন ম্যাক্লিওডের সাথে এই পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করেন। ম্যাক্লিওড তাকে পরীক্ষা চালানোর বন্দোবস্ত করে দেওয়ার সাথে সাথে ছাত্র চার্লস বেস্টকে নিয়োগ করেন ব্যান্টিংকে সহায়তা করার জন্য। বেস্ট এবং বায়োকেমিস্ট জেমস কলিপের সহায়তায় ব্যান্টিং এই উপায়ে ইনসুলিন উৎপাদন করতে সক্ষম হন। 1922 সালের 11 জানুয়ারী টরন্টো জেনারেল হাসপাতালে 14 বছর বয়সী কানাডিয়ান লিওনার্ড থম্পসনকে ইনসুলিনের প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। 1941 সালের 21 ফেব্রুয়ারী ব্যান্টিংয়ের মৃত্যু হয়।

লর্ড র‍্যালে

জন উইলিয়াম স্ট্রুট, 3য় ব্যারন র‍্যালে, 12 নভেম্বর 1842 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ ও পদার্থবিদ। বিজ্ঞানে তার অপরিসীম অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তার সমস্ত শিক্ষাজীবন কাটিয়েছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক সম্মানের মধ্যে, তিনি পদার্থবিজ্ঞানে 1904 সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসের ঘনত্বের গবেষণার জন্য এবং এই গবেষণার অঙ্গ হিসাবে আর্গন আবিষ্কারের জন্য"। তিনি 1905 থেকে 1908 সাল পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং 1908 থেকে 1919 সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। র‍্যালে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট কণা দ্বারা আলোর স্থিতিস্থাপক বিচ্ছুরণের প্রথম তাত্ত্বিক প্রয়োগের কথা বলেন। এই তত্ত্ব "র‍্যালে স্ক্যাটারিং" নামে পরিচিত, যা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করে যে আকাশ কেন নীল দেখায়। তিনি কঠিন পদার্থে অনুপ্রস্থ পৃষ্ঠ তরঙ্গ অধ্যয়ন এবং বর্ণনা করেছিলেন, যা এখন "র‍্যালে তরঙ্গ" নামে পরিচিত। তিনি প্রবাহী গতিবিদ্যায় ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছিলেন। র‍্যালে সংখ্যা (প্রাকৃতিক পরিচলনের সাথে যুক্ত একটি মাত্রাবিহীন সংখ্যা), র‍্যালে ফ্লো, র‍্যালে-টেইলর অস্থিরতা এবং টেলর-কুয়েট প্রবাহের স্থায়িত্বের জন্য র‍্যালে-এর মানদণ্ডের মত ধারণার প্রবক্তা ছিলেন তিনি। তিনি এরোডাইনামিক লিফটের সঞ্চালন তত্ত্বও প্রণয়ন করেন। অপটিক্সে র‍্যালে কৌণিক রেজোলিউশনের জন্য একটি সুপরিচিত মানদণ্ড প্রস্তাব করেছিলেন। ক্লাসিক্যাল ব্ল্যাক-বডি রেডিয়েশনের জন্য তার র‍্যালে-জিন্স নিয়ম পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। র‍্যালে-এর পাঠ্যপুস্তক The Theory of Sound (1877) আজও ধ্বনিবিদ ও প্রকৌশলীরা ব্যবহার করেন। 1919 সালের 30 জুন এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

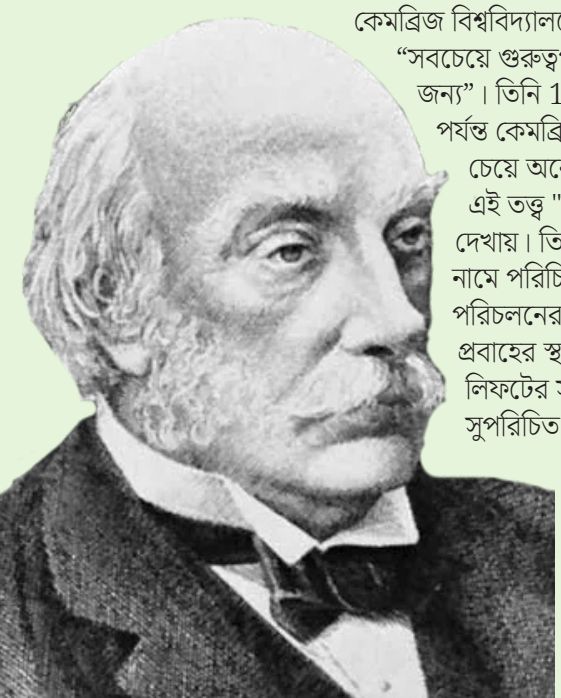

জে ভ্যান ডার ওয়ালস

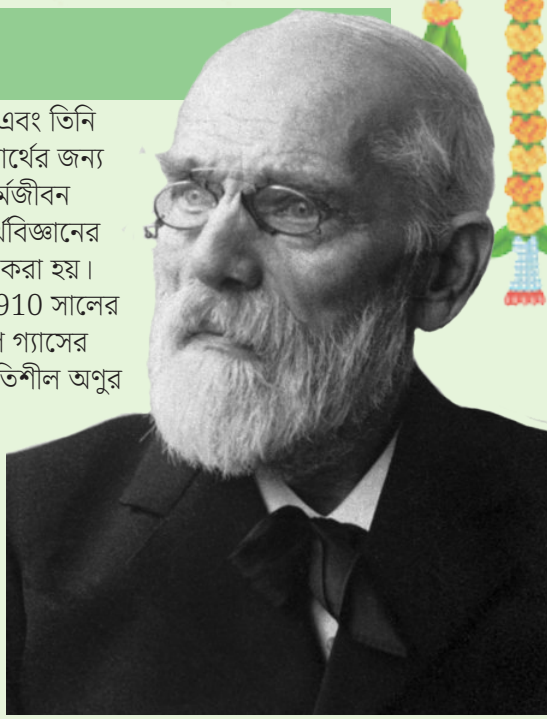

জোহানেস ডিডেরিক ভ্যান ডার ওয়ালস 1837 সালের 23 নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন ডাচ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ এবং তাপগতিবিদ ছিলেন। তিনি গ্যাস ও তরল পদার্থের জন্য অবস্থার সমীকরণ নিয়ে তার অগ্রণী কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ভ্যান ডার ওয়ালস তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে। তিনি আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন যখন 1877 সালে পুরানো অ্যাথেনিয়ামকে মিউনিসিপাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করা হয়। ভ্যান ডার ওয়ালস গ্যাস এবং তরল পদার্থের অবস্থার সমীকরণের উপর তার কাজের জন্য 1910 সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রাথমিকভাবে অবস্থার ভ্যান ডার ওয়াল সমীকরণ গ্যাসের আচরণ এবং তরল পর্যায়ে তাদের ঘনীভবন বর্ণনা করে। তার নাম ভ্যান ডার ওয়ালস বল (স্থিতিশীল অণুর মধ্যে কার্যকরী বল), ভ্যান ডার ওয়াল অণু (ভ্যান ডার ওয়াল বল দ্বারা আবদ্ধ ছোট আণবিক স্তর) এবং ভ্যান ডার ওয়ালস রেডিআই (অণুর আকার)-এর সাথেও যুক্ত। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল একবার বলেছিলেন যে, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে ভ্যান ডার ওয়ালসের নাম শীঘ্রই আণবিক বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের পর্যায়ভুক্ত হবে।" 1873 সালে ভ্যান ডার ওয়ালস তাত্ত্বিকভাবে দেখান বাস্তব গ্যাসের সাথে আদর্শ গ্যাসের ব্যবহারের তফাতের জন্য দায়ী আন্তঃআণবিক মিথস্ক্রিয়া। তিনি গঠনকারী অণু দ্বারা দখলকৃত একটি সসীম আয়তনের অনুমান দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থার প্রথম সমীকরণ প্রবর্তন করেন। সেসময় আর্নস্ট মাক এবং উইলহেম অস্টওয়াল্ডের নেতৃত্বে একটি প্রভাবশালী মতবাদ অণুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো। আণবিক অস্তিত্বকে অপ্রমাণিত এবং আণবিক অনুমানকে অপ্রয়োজনীয় বলে দাবি করা হত। ভ্যান ডার ওয়ালস-এর থিসিস লেখার সময় (1873) তরল পদার্থের আণবিক গঠন বেশিরভাগ পদার্থবিদরা গ্রহণ করেন নি এবং তরল এবং বাষ্পকে প্রায়শই রাসায়নিকভাবে স্বতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ভ্যান ডার ওয়ালসের কাজ অণুর বাস্তবতাকে নিশ্চিত করে তাদের আকার এবং আকর্ষণ বলের মূল্যায়নের সংকেত দিয়েছে। পরীক্ষামূলক তথ্যের সাথে তার অবস্থার সমীকরণ তুলনা করে ভ্যান ডার ওয়ালস অণুর প্রকৃত আকার এবং তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বল অনুমান করতে সক্ষম হন। 1923 সালের 8ই মার্চ এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

বীরবল সাহনি

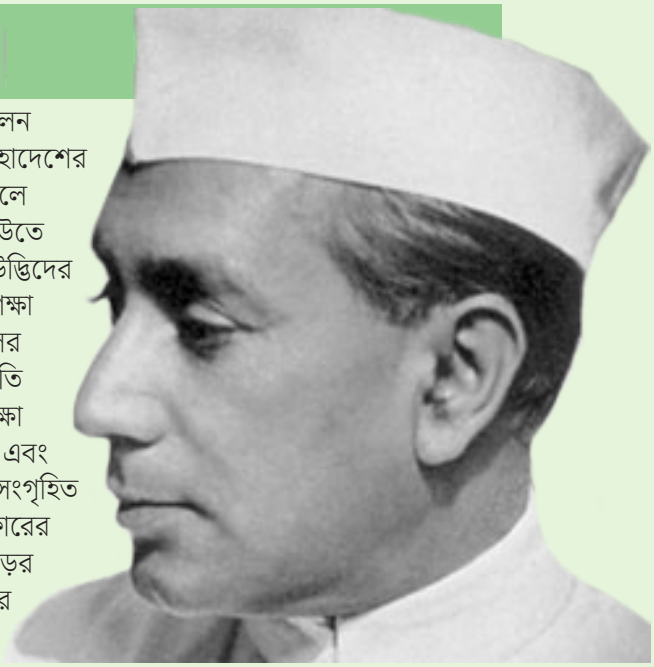

বীরবল সাহনি 1891 সালের 14 নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় জীবাশ্মবিদ ছিলেন। তার কাজের অন্যতম বিষয় ছিল উপমহাদেশের জীবাশ্ম গবেষণা। তিনি ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বেও সমান আগ্রহী ছিলেন। তিনি 1936 সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির একজন ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি 1946 সালে লখনউতে বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওবোটানি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের জীবাশ্ম উদ্ভিদের অধ্যয়ন এবং উদ্ভিদের বিবর্তনে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠার সাথেও জড়িত ছিলেন এবং ভারতের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেসের সভাপতি এবং স্টকহোমের আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের সাম্মানিক সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিবর্তনীয় প্রবণতা এবং ভৌগলিক বন্টন পরীক্ষা করতে গিয়ে নেফ্রোলেপসিস, নিফোবোলাস, ট্যাক্সাস, সাইলোটাম, টেমিসিপ্টেরিস এবং অ্যাকমোপিল সহ বহু জীবন্ত উদ্ভিদের প্রজাতি নিয়ে কাজ করেছেন। হরপ্পা থেকে সংগৃহিত কাঠের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করার সময় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সেগুলি কনিফারের ছিল এবং তার থেকে তিনি অনুমান করেন যে সেখানকার লোকদের অবশ্যই পাহাড়ের লোকেদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল যেখানে কনিফার জন্মাতে পারে। উদ্ভিদের বাস্তুশাস্ত্র এবং জীবাশ্মের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে, তিনি হিমালয়ের উত্থানের হারও অনুমান করার চেষ্টা করেছিলেন। সাহনি সঙ্গীতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেতার ও বেহালা বাজাতে পারতেন। তিনি ক্লে-মডেলিং এবং দাবা ও টেনিস খেলার প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। অক্সফোর্ডে তিনি ভারতীয় মজলিসের হয়ে টেনিস খেলতেন। তার অন্যান্য আগ্রহের মধ্যে রয়েছে ভূতত্ত্ব, ফটোগ্রাফি, প্রত্নতত্ত্ব এবং মুদ্রাবিদ্যা। 1936 সালে তিনি খোকরা কোটের একটি খনন থেকে 100 খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু মুদ্রা ও ছাঁচ পরীক্ষা করেন এবং মুদ্রার ঢালাইয়ের সাথে জড়িত সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন। এই সংগ্রহটি এখন নয়াদিল্লির জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে। 1949 সালের 10 এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের নভেম্বর মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ভর ও শক্তির তুল্যতা সংক্রান্ত আইনস্টাইনের সমীকরণ

1905 সালে ছাব্বিশ বছর বয়সী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা গবেষণাগারের বিজ্ঞানী ছিলেন না। সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে পেটেন্ট অফিসে কর্মরত অবস্থায় তিনি পদার্থবিদ্যায় যুগান্তকারী ধারণা সম্বলিত যে চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন তার চতুর্থটি প্রকাশিত হয় 21 নভেম্বর, জার্মান গবেষণা জার্নাল অ্যানালেন ডার ফিজিক-এ। এই গবেষণাপত্রে

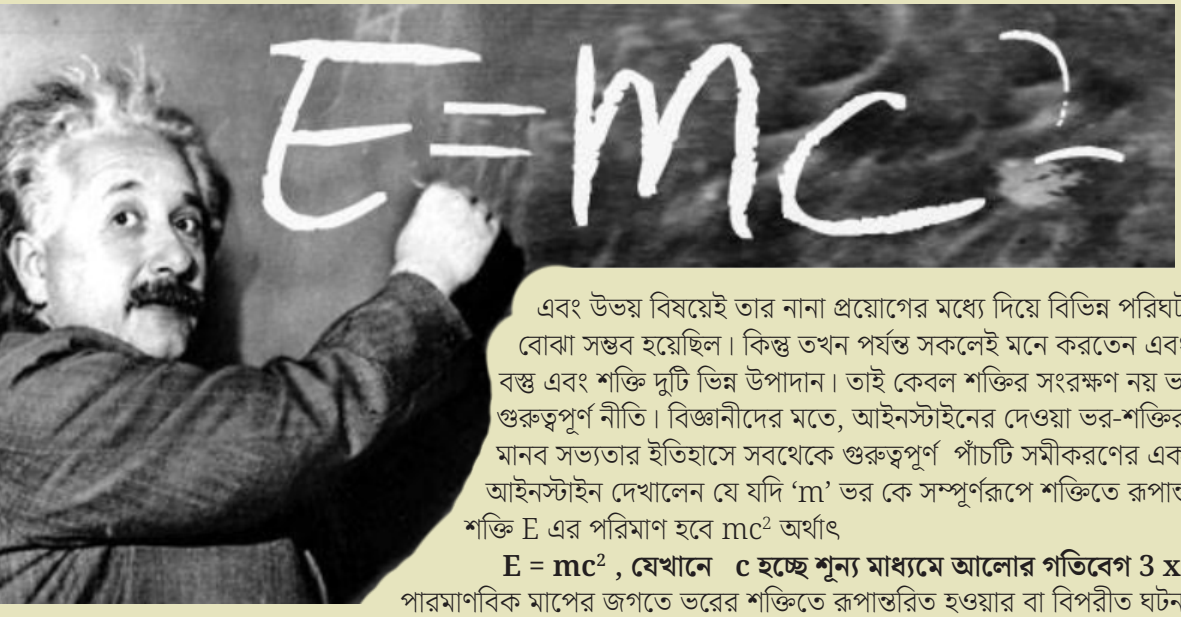

আইনস্টাইন তাত্ত্বিক ভাবে দেখান যে ভর ও শক্তি সমতুল, এবং একটি থেকে অপরটি পাওয়া যেতে পারে। শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সঙ্গে পদার্থবিদ বা রসায়নবিদের তার প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে থেকে পরিচিত ছিলেন এবং উভয় বিষয়েই তার নানা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পরিঘটনার ব্যাখ্যা তথা সম্যকভাবে বোঝা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত সকলেই মনে করতেন এবং গ্রহণ করেছিলেন যে ভর বা বস্তু এবং শক্তি দুটি ভিন্ন উপাদান। তাই কেবল শক্তির সংরক্ষণ নয় ভরের সংরক্ষণও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। বিজ্ঞানীদের মতে, আইনস্টাইনের দেওয়া ভর-শক্তির সম্পর্কযুক্ত সমীকরণটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সমীকরণের একটি। এই সমীকরণে আইনস্টাইন দেখালেন যে যদি 'm' ভর কে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে সেই শক্তি E এর পরিমাণ হবে mc^2 অর্থাৎ

$E = mc^2$, যেখানে c হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ 3 x 108 মিটার/সেকেন্ড

পারমাণবিক মাপের জগতে ভরের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার বা বিপরীত ঘটনা ধরা পড়ে। সেখানে এই সূত্রের প্রয়োগ করে সঠিক ফল পাওয়া গেছে। যেমন সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত নিঃসারিত শক্তি পাওয়া যাচ্ছে সূর্যের কিছু ভর হারিয়ে যাওয়ার ফলে।

মেরিনার ৯ মার্স অর্বিটার

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে 1971 সালের মে মাসে নাসার পাঠানো একটি মহাকাশযান পৌঁছে গিয়েছিল সৌরগ্রহ মঙ্গলের দোরগোড়ায়। সেটা ছিল নভেম্বর মাসের 14 তারিখ। কেবল তাই নয় মেরিনার 9 নামের সেই মহাকাশযানকে বলা হয়েছিল রোবোটিক স্পেসক্রাফট আর সেই মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করেছিল, সংগ্রহ করেছিল সেই গ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য। কেবল তাই নয় এটি ছিল মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করা প্রথম মহাকাশযান। মেরিনার 9 এর কাজও হয়েছিল চমৎকার। প্রথমে মঙ্গলের বুকে ওঠা ধূলিঝড়ে তার কাজ ব্যহত হলেও পরবর্তীকালে তা কাজ শুরু করে এবং 1972 সালের অক্টোবর পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালন করে সেখান থেকে সাত হাজারের বেশি ইমেজ বা ফটো পাঠায় নাসাকে।

সেই সময় মহাকাশ অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিযোগিতা ছিল খুবই তীব্র। বস্তুত মেরিনার 1971 এর মে মাসের 30 তারিখে পৃথিবী ছাড়ার ঠিক আগে মে মাসের 19 ও 28 তারিখে সোভিয়েত রাশিয়া মার্স 2 এবং মার্স 3 নামের দুটি মহাকাশযানকে পাঠায় ওই একই উদ্দ্যেশ্যে। সে দুটি মহাকাশযান আগে যাত্রা শুরু করলেও মঙ্গলগ্রহে পৌঁছোয় মেরিনার পৌঁছনোর দু-এক সপ্তাহ পরে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে মহাকাশযানের মঙ্গল প্রদক্ষিণ ছিল আর এক প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা।

ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের ঘোষণা

শব্দ রেকর্ড করার ব্যাপারে আজকের প্রযুক্তি অনেকগুলি সহজ সরল, বহনযোগ্য যন্ত্র ও ব্যবস্থা আমাদের হাতে এখন তুলে দিয়েছে। তাই এডিসনের ফোনোগ্রাফের উদ্ভাবনা সম্ভবত আমাদের সেরকম ভাবে মনে থাকে না। অথচ 1877 সালের নভেম্বর মাসে যখন এডিসন যখন কোন শব্দ রেকর্ডিং এবং তারপরে তা বাজিয়ে শোনানোর উপায় হিসেবে তার বিখ্যাত যন্ত্র ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন তা ছিল প্রকৃত অর্থে এক বৈপ্লবিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনা। ফটোগ্রাফির সঙ্গে আমাদের তার আগেই পরিচয় ঘটেছে, জানা গেছে যে কোন বিশেষ মুহূর্ত ধরে রাখা সম্ভব ফটো তুলে। কিন্তু মানুষের, পশুপাখির বা অন্য শব্দ কীভাবে ধরে রাখা যায়? যে বিখ্যাত গায়কটিকে ফটোতে দেখা যাচ্ছে তার সামনে না বসলেও কীভাবে আমরা শুনতে পাবো তার গান? একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে মানুষের জীবন পালটে দেওয়ার মত এই আবিষ্কার কত বড় প্রভাব বিস্তার করেছে মানব সভ্যতায়। অবশ্যই প্রথম ফোনোগ্রাফ থেকে যে যন্ত্রটি যাত্রা শুরু করেছিল তা কীভাবে রেকর্ড প্লেয়ার, টার্নটেবিল প্রভৃতি ধাপের মধ্যে দিয়ে এসেছে তার খানিকটার সঙ্গে হয়ত আজকের প্রবীণ মানুষেরা কিছুটা পরিচিত। ●

পুশ-বাটন টেলিফোন

টেলিফোনের প্রথম যুগের যন্ত্রগুলি ছিল রোটারি ডায়াল যুক্ত। পরবর্তী সময়ে এল পুশ-বাটন টেলিফোন। 1941 সালের প্রথম দিকে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক দশটি সংখ্যার প্রতিটির জন্য দুটি টোন তৈরি করার জন্য যান্ত্রিকভাবে সক্রিয় বোতাম ব্যবহার করার পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করে এবং ওই দশকের শেষের দিকে পেনসিলভেনিয়ায় একটি নং 5 ক্রসবার স্যুইচিং সিস্টেমে এই ধরনের প্রযুক্তি ফিল্ড-পরীক্ষিত হয়। তৎকালীন প্রযুক্তিটি বিজ্ঞানী ও ব্যবহারকারীদের কাছে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে পারে নি, ফলে ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের বহুদিন পরেও পুশ-বাটন প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় নি। 18 নভেম্বর 1963-এ, প্রায় তিন বছরের গ্রাহক পরীক্ষার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেল সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে তার নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক টাচ-টোনের অধীনে ডুয়াল-টোন মাল্টি-ফ্রিকোয়েন্সি (ডিটিএমএফ) প্রযুক্তি চালু করে। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে টাচ-টোন পরিষেবাটি প্রথাগত পালস ডায়ালিং প্রযুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং বর্তমানে এটি টেলিকমিউনিকেশন সিগন্যালিংয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং এক অর্থে বলতে গেলে পুশ-বটন টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কার ছিল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির দুনিয়ায় অগ্রগতির এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ●

বিক্রম-এস রকেট উৎক্ষেপণ

ভারতের প্রথম অ-সরকারি উদ্যোগে নির্মিত রকেট বিক্রম-এস, শ্রীহরিকোটায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ISRO) লঞ্চপ্যাড থেকে 18 নভেম্বর, 2022 তারিখে ঠিক সকাল 11.30 টায় তার পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। হায়দ্রাবাদ-ভিত্তিক স্টার্টআপ স্কাইরুট অ্যারোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা তৈরি, 6-মিটার লম্বা যানটি 89.5 কিলোমিটারের সর্বোচ্চ উচ্চতা স্পর্শ করেছিল। সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছতে এই রকেটের সময় লেগেছিলো 144 সেকেন্ড। এই মিশনটির নাম রাখা হয়েছিল 'প্রারম্ভ'। বিক্রম-এস রকেটটি ছিল একটি একক-পর্যায়ের কঠিন জ্বালানীযুক্ত, সাব-অরবিটাল রকেট এবং এটি তৈরী করতে কার্বন কম্পোজিট স্ট্রাকচার, 3D-প্রিন্টেড উপাদান সহ বহু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। রকেটটি তৈরী করতে সময় লেগেছিল দুই বছর। এর গ্রস লিফট অফ ভর ছিল 545 কিগ্রা এবং পেলোড ভর ছিল 80 কিগ্রা। স্কাইরুটের পরবর্তী রকেট বিক্রম-1 অরবিটাল যানেও একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং এবছর এই রকেটটি লঞ্চের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মহাকাশ বিভাগের IN-SPACe-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই রকেট উৎক্ষেপণটি সম্ভবত ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত মহাকাশ গবেষণা নীতি সংস্কারের পর থেকে ভারতীয় বেসরকারী উদ্যোগে মহাকাশ গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ●

গ্রন্থ সমালোচনা

নির্বাচিত জনবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংকলন

নির্বাচিত জনবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংকলন
ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
ISBN: 978-81-7480-421-1
পৃষ্ঠা: 136 | মূল্য: 125.00

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় তথ্য ও তথ্য কিশোরদের সামনে তুলে ধরে বিজ্ঞান চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল 'জীবনচরিত' ও 'বোধোদয়'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এমন রচনাকে মনে করা যেতে পারে পৌনে দু'শো বছর আগে (1850-এর) সমাজ বিজ্ঞানের 'বর্ণপরিচয়' ও 'ধারাপাত'। গত প্রায় দুই শতক ধরে এই ধারাপাত-এর ধারায় বাংলায় এগিয়েছে 'জন বিজ্ঞান' বা 'লোক বিজ্ঞানের' চলার পথ। বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা ও জনপ্রিয়করণে যশস্বীদের অমর কীর্তির সাথে সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক অনবদ্য লেখনীতে প্রকাশ করেছেন ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার।

জনবিজ্ঞান আন্দোলনকে দৃঢ় করতে ডঃ জোয়ারদার গত দুই দশকে রচনা করেছেন নানা প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান প্রবন্ধ। বিজ্ঞান প্রসারের উদ্যোগে তারই কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ সমূহের সংহত রূপ হল "নির্বাচিত জনবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংকলন"। মাত্র 128 পৃষ্ঠার এই সংকলনে রয়েছে চারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় রয়েছে 'করোনাভাইরাস ও কোভিড-19' রোগ সম্পর্কিত দশটি প্রবন্ধ। প্রাণী ও মানুষের মধ্যে রোগের সংক্রমণ নিয়ে 'মানুষের কিছু উঠতি রোগ' বিষয়ক আটটি প্রবন্ধ রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে। তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে 'বিজ্ঞানী/মনীষীদের জীবনী ও কার্যকলাপ'। চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার থেকে শুরু করে বাজির ধোঁয়া ও রোগের ছোঁয়া— এমন 'বিবিধ' প্রসঙ্গে আঠারোটি রচনা।

সংকলনের বৈচিত্র্যময় রচনা সম্ভার সমৃদ্ধ করবে বিজ্ঞানের ছাত্র গবেষক থেকে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান প্রচারকদের। নোভেল করোনাভাইরাস (সার্স কোভ-2) ও এর মিউট্যান্ট ভ্যারিয়েন্টদের আণবিক চরিত্র ছবিসহ বর্ণিত হয়েছে রচনায়। সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ভাইরাস কিভাবে মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে আর শরীরের সুসজ্জিত প্রতিরোধ বাহিনী কিভাবে তার মোকাবেলা করে। প্রসঙ্গক্রমে, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বিশেষ খাবারের উপর অগাধ আস্থার অবৈজ্ঞানিক ভাবনাকে এড়িয়ে চলার পরামর্শও রয়েছে এই প্রকাশনায়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাস্ক পড়ে বেশ কিছু রোগ জীবাণু সংক্রমণকে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাস, ব্রুসেলোসিস, ডেঙ্গু, মাংকি পক্স, নিপাহ ইত্যাদির মতন কিছু উঠতি রোগের চাল-চরিত্রকে মোকাবেলার ধরন আলাদা। দিক নির্দেশ করা হয়েছে 'এক স্বাস্থ্য' ভাবনার। সেখানে সুবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাকৃতিক দূষণ বা বিপর্যয় যেমন মানুষের অস্বাস্থ্যের কারণ হতে পারে, তেমনি-প্রাণী পুষ্টি ও প্রাণীর রোগ-ব্যাধির অবহেলায় ঘটতে পারে মানুষের স্বাস্থ্যহীনতা। তাই মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রত্যেকের সচেতন হওয়ার দরকার। লেখক আহ্বান জানিয়েছেন প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখার।

প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের কর্মজীবনকে। একই সাথে বর্ণিত হয়েছে লুই পাস্তুরের গবেষণা কিভাবে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাকে সুরক্ষিত করেছে। বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ে প্রথাগত বিজ্ঞানের পাঠ না নিয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিভাবে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটিয়েছেন। কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে স্বাধীনতার 75 বছরে বিশিষ্ট কৃষি-পতঙ্গ বিজ্ঞানী ডঃ হেম সিং প্রুথি এবং বিশিষ্ট প্রাণী-চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাক্তার সচিদানন্দ দত্তের জীবনী ও অবদান সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে সংকলনে।

সংকলনটির 'বিবিধ' অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে সুস্থ জীবনের স্বার্থে কোষের অসীম ভূমিকার কথা। আবার বলা হয়েছে কোষের বিকলতায় ক্যান্সার সৃষ্টির রহস্যও। আধুনিক গবেষণায় 'জিন অনুপ্রবেশ' প্রযুক্তির সুফল মানুষ কিভাবে নেবে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে, কিন্তু ছাগলের কানের মত ফেলে দেওয়া অংশের তরুনাস্থি ব্যবহার করে মুখশ্রীর পরিবর্তনে কোন বিতর্ক নেই। বিজ্ঞানের এই কঠিন তথ্যগুলিকে সহজ ভাবে পরিবেশিত এই সংকলনে দু'শো বছরের বাংলার বিজ্ঞান চর্চার সংস্কৃতির সাথে 130 বছরের প্রাচীন ভেটেরিনারি শিক্ষা ও অতি সম্প্রতি অতিমারি ও মহামারীর শিক্ষাকেও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংকলনের প্রবন্ধগুলির সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় হ'ল বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বকে যে কোনো মানুষের বোঝার মতো করে পরিবেশনা।

রচনা তথ্যসূত্র সমেত মাত্র 125 টাকার বিনিময় মূল্যে এই সংকলনটি বাংলায় বিজ্ঞান প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। প্রচ্ছদ সহ বইতে ব্যবহৃত ছবিগুলির আরো উন্নত মান, আশা করা যায় দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠকদের অতৃপ্তিকে পূরণ করবে।

প্রোঃ প্রদীপ কুমার দাস
অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
pkdaskolphy@gmail.com

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।